আচার্য প্রমথনাথ

মনোরঞ্জন গুপ্ত

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ

আচার্য প্রমথনাথ বসু

মনোরঞ্জন গুপ্ত, বি. এস-সি

'Two New Pala Records', 'আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়',
'আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু' ও 'ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার',
'Historical Relics etc. in the Bangiya
Sahitya Parisad Museum'
এর গ্রন্থকার ;
প্রবাসী, ভারতবর্ষ, সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, জ্ঞান ও বিজ্ঞান,
Science & Culture, Journal of the Asiatic Society
প্রভৃতি পত্রিকার লেখক,
বেঙ্গল কেমিক্যালের অবসরপ্রাপ্ত রাসায়নিক।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ

[বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের সৌজন্যে]

ACHARYA PRAMATHANATH BASU
by Sri Monorajan Gupta

প্রথম পর্ষদ সংস্করণ
প্রকাশকাল—জুলাই, ১৯৭৯

প্রকাশক :
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ
আর্য ম্যানসন (নবমতল)
৬এ রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার
কলিকাতা-৭০০০১৩

মুদ্রাকর :
সুধাতোষ বসু
ইম্প্রেশন
৩৩ বি, মদন মিত্র লেন
কলিকাতা-৬

চিত্রাঙ্কন : হেমকেশ ভট্টাচার্য

প্রচ্ছদ : বিমল দাস

দাম : দুই টাকা চল্লিশ পয়সা

Published by Pradyumna Mitra, Chief Executive Officer, West Bengal State Book Board under the Centrally Sponsored Scheme of Production of books and literature in regional language at the University level, launched by the Government of India, the Ministry of Education and Social Welfare (Department of Culture), New Delhi.

পুস্তক পর্ষদ সংস্করণের ভূমিকা

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ প্রকাশিত এবং অধুনা দুষ্প্রাপ্য লোকরঞ্জন বিজ্ঞান-পুস্তিকামালার অন্তর্গত সুখপাঠ্য নিবন্ধিকাগুলি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ পুনর্মুদ্রণে অগ্রণী হয়েছেন। জ্ঞান বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় যেসব দুষ্প্রাপ্য অথচ ছাত্র ও শিক্ষার্থীর উপযোগী পুস্তকাদি রয়েছে সেগুলির পুনর্মুদ্রণ-প্রকল্পের অন্তর্গত এই কার্যসূচী। বিজ্ঞান পরিষদ পুস্তিকামালার জনপ্রিয়তা ও দুষ্প্রাপ্যতা এ-জাতীয় পুস্তিকাগুলির পুনর্মুদ্রণ সম্পর্কে আমাকে উৎসাহিত করে। ফলে পরিষদ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে ও পর্ষদ পরিচালক মণ্ডলীর অনুমোদন সংগ্রহ করে আমি একাজে ব্রতী হই। পরিষদ কর্তৃপক্ষ প্রকাশনা অনুমতিদানে আমার প্রয়াসকে সার্থকতা দিয়েছেন। তাঁদের কাছে আমি পশ্চিমবঙ্গের সকল পড়ুয়া শিক্ষার্থীর পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে রাখি। এখন আমাদের এই মুদ্রণপ্রয়াস যদি পাঠকসমাজের আনুকূল্যলাভে সমর্থ হয়, তবেই এ-জাতীয় ভবিষ্যত কর্মদ্যোগে পর্ষদ কতৃপক্ষ উৎসাহ বোধ করবেন। আশা রাখি সুধী পাঠক ও শিক্ষার্থী উভয়েই এই গ্রন্থমালার পুনঃপ্রকাশনা উদ্যমকে স্বাগত জানাবেন।

কলিকাতা
জুলাই, ১৯৭৯

প্রদ্যুম্ন মিত্র
মুখ্য প্রশাসন আধিকারিক

নিবেদন

মহেন্দ্রলাল সরকার, প্রমথনাথ বসু, জগদীশচন্দ্র বসু ও প্রফুল্লচন্দ্র রায়—এই চারজন এদেশে পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানসাধনার অগ্রদূত। চারজনই কর্মী, স্রষ্টা ও জননেতা। ভারতের ধর্ম, কৃষ্টি ও প্রজ্ঞা এঁদের জীবনকে এমন আত্মনিবেদনে অনুপ্রাণিত করেছিল যা একালের দিনে দুর্লভ। এই দুর্লভ ও অনুকরণীয় জীবনগুলির তাই পুনঃ পুনঃ অনুধ্যান আবশ্যক।

বেঙ্গল টেক্‌নিক্যাল ইনষ্টিটিউট—যা পরিণামে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়েছে—তার স্রষ্টাদের অন্যতমরূপে আজও অনেক প্রবীণ বাঙালীর স্মৃতিতে প্রমথনাথ বসু অম্লান হয়ে আছেন। আবার ইনিই যে ভূতত্ত্ববিদ্ পি. এন. বোস্ রূপে নিজের অবিস্মরণীয় আবিষ্কারের দ্বারা পৃথিবীখ্যাত টাটার লোহার কারখানা জামশেদপুরে স্থাপন করিয়েছিলেন, সে-কথা অনেক ভারতবাসীর কাছে নূতন সংবাদ বলে মনে হবে।

এদেশের সভ্যতা, শিল্পশিক্ষা, সমাজ সংস্কার ও জাতীয় জাগরণ—স্বদেশের মঙ্গল বিধানে এই সকল বিষয়ে প্রমথনাথের চিন্তা ও লেখনী প্রায় পঞ্চাশ বৎসর নিয়োজিত ছিল। কিন্তু কলকাতার কোলাহল ও বক্তৃতার মঞ্চ হতে দূরে তিনি জীবনের শেষ বাইশ বছর কাটিয়েছিলেন। তাই তাঁর শেষ বয়সে জনচিত্তে এই আচার্যের মূর্তি চিরজাগ্রত ছিল না। তবু প্রমথনাথের ধ্যানার্জিত সাহিত্য দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিদের আদরের সামগ্রী হয়েছিল এবং আজও তা মূল্যবান্।

ভিন্ন ভিন্ন কর্মধারায় প্রবাহিত এই চারজন মানুষের জীবনের মূলসূত্র উপলব্ধি করার জন্য যে চেষ্টা করেছি তদ্দ্বারা তাঁদের জীবনের আত্ম-নিবেদনের আদর্শ উদ্ঘাটিত হয়েছে। সেই সূত্র অবলম্বন করে স্বল্পায়তন মধ্যে তাঁদের জীবনমালা যদি গ্রন্থিত হয়ে থাকে তবে তা ভারতের জীবনদেবতার পদতলে উৎসর্গ করছি।

৯ই, যোগোদ্যান লেন, কলকাতা-১১ — মনোরঞ্জন গুপ্ত

৬ই ভাদ্র, জন্মাষ্টমী, ১৩৬৯

সুচীপত্র

বিষয়			পৃষ্ঠা
পুস্তক পর্ষদ সংস্করণের ভূমিকা		…	(গ)
নিবেদন	…	…	(ঙ)
সূচীপত্র	….	…	(ছ)
আচার্য প্রমথনাথ বসুর জীবনপঞ্জী		…	(ঝ)
ভূমিকা : অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু		…	(ট)
আচার্য প্রমথনাথ বসুর ছবি		…	(ণ)
প্রারম্ভ কথা	…	…	১
জন্ম ও বাল্যকথা	…	…	৩
কৃষ্ণনগরে বিদ্যাশিক্ষা	…	…	৫
কলেজের পড়া	….	…	৭
বিলাতে পড়াশুনা	…	…	৮
বিলাতে অবস্থান ও চাকরীর চেষ্টা		…	১০
দেশে প্রত্যাগমন ও সামাজিক বাধা		…	১১
বিবাহ	…	…	১২
ভারতীয় ভূতত্ত্ববিভাগের প্রারম্ভ		…	১৪
ভূতত্ত্ব বিভাগের কাজ		…	১৫
প্রমথনাথ কর্তৃক ভারত ও ব্রহ্মদেশে খনিজের আবিষ্কার, ১৮৮০ হতে ১৮৯৩		…	১৬
ভূতত্ত্ববিদ্ প্রমথনাথ ও তাঁর সরকারা চাকরী ১৮৯৩-১৯০৩			১৭
প্রমথনাথের সরকারী চাকরী ও কমলাদেবীর সহযোগ			১৯
সরকারী চাকরী ত্যাগ		….	২১
বিজ্ঞান ও শিল্পের প্রচার		…	২৩
স্বদেশী প্রমথনাথ	…	…	২৪

প্রমথনাথ বসুর জীবনপঞ্জী

১৮৫৫ ২৪ পরগণা জেলার অন্তর্গত গৈপুর গ্রামে (যমুনানদীর পূর্বতীরস্থ) ১২ই মে তারিখে জন্ম।

১৮৬৪ কৃষ্ণনগরে পড়াশুনা আরম্ভ।

১৮৭১ কম বয়সহেতু এনট্রান্স পরীক্ষার জন্য এক বৎসর থেমে থাকতে হল। কবিতার বই লিখলেন, 'অবকাশ কুসুম'।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দ্বিতীয় হয়ে 'এনট্রান্স' পাশ করলেন।

১৮৭৩ কৃষ্ণনগর কলেজ হতে পঞ্চম হয়ে এফ. এ. পাশ করলেন। এবং কলকাতা সেন্টজেভিয়ার্স কলেজে ভর্তি হলেন। সেখানে বৃত্তি-পাওয়া মাসিক ২৫.০০ টাকাতেই ব্যয় নির্বাহ হত।

১৮৭৪ পরীক্ষায় প্রথম হয়ে গিলক্রাইষ্ট বৃত্তি পেলেন। সেপ্টেম্বর মাসে ইংলণ্ড রওনা হলেন।

১৮৭৮ বি. এস-সি পাশ করে 'এডোয়ার্ড ফরবেশ' পদক ও পুরস্কার পেলেন।

১৮৭৯ গিলক্রাইষ্ট বৃত্তি অন্ত হলে বক্তৃতা, লেখা ও সিভিল সার্ভিসের ছাত্র পড়িয়ে উপার্জন করে বিলাতেই থাকলেন। ইণ্ডিয়া সোসাইটির কর্মী হলেন।

১৮৮০ ভারত গভর্ণমেণ্টর ভূতত্ত্ব বিভাগের উচ্চপদে নিযুক্ত হলেন। ১৩ই মে তারিখে বিলাতেই কার্যে যোগদান করলেন। ৩০শে জুলাই স্বদেশে প্রত্যাবর্তন।

১৮৮২ ২৪শে জুলাই দেশবিখ্যাত রমেশচন্দ্র দত্তের (সিভিলিয়ান ও ঐতিহাসিক) বড়মেয়ে কমলার সঙ্গে বিবাহ হয়।

১৮৮৪ 'The Centenary review of the researches of the Asiatic Society of Bengal in Natural Sciences'—'প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে বঙ্গদেশীয় এসিয়াটিক সোসাইটির গত একশত বৎসরের গবেষণা' শীর্ষক শতাধিক পৃষ্ঠার একটি পুস্তক সম্পাদন

বিষয়		পৃষ্ঠা
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের আদি	...	২৫
ময়ূরভঞ্জরাজ্যের খনিজের আবিষ্কার	...	২৮
টাটার লোহার কারখানা	...	৩০
আরও খনিজের সন্ধান	...	৩৩
ভূতত্ত্ববিদ্ প্রমথনাথের কর্মজীবনের ফল	...	৩৪
প্রমথনাথের গৃহিণী কমলাদেবী	...	৩৬
প্রমথনাথের পুত্রকন্যাগণ	...	৩৯
রাঁচীতে প্রমথনাথ ...	....	৪৪
দিন যাপন ...	...	৪৫
প্রমথনাথের ধর্ম ...	...	৪৭
আচার্য প্রমথনাথের রচনা	...	৫২
তিরোধান ...	...	৬০
পরিশিষ্ট ...	...	৬১
(ক) বিলাতে থাকার সময় প্রমথনাথের প্রবন্ধ রচনার তালিকা		৬১
(খ) বাংলা পুস্তকের তালিকা	...	৬১
(গ) ভারতের খনিজ বিষয়ে আবিষ্কার প্রবন্ধের তালিকা		৬১
(ঘ) ইংরাজী পুস্তক ও পুস্তিকার তালিকা	...	৬৩
(ঙ) কতকগুলি প্রবন্ধের তালিকা—যা পুস্তাকাকারে দেখা যায়নি		৬৬

করেন। তখনকার তাঁর ২৯ বৎসর মাত্র বয়সে এই দুরূহ বিষয়ের বিস্তৃত জ্ঞান ও দক্ষতা তৎকালীন বিদ্বৎসমাজে তাঁর জন্য বিশেষ সম্মান অর্জন করেছিল। 'প্রাকৃতিক ইতিহাস' লিখলেন।

১৮৮৬ A Central Technological Institute স্থাপনের জন্য আন্দোলনের সূচনা করলেন; অক্টোবর মাসে 'Technical and Scientific Education in Bengal' শীর্ষক পুস্তিকা প্রকাশ করলেন।

১৮৯০ প্রেসিডেন্সি কলেজে 'ভূতত্ত্ব' বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান।

১৮৯১ ভারতীয় শিল্পসম্মিলন (Indian Industrial Conference)-এর ভিত্তি স্থাপন।

১৮৯৪ সাবানের কারখানা খুললেন।

১৮৯৬ আসানসোলে কয়লার খনি পরিচালনা।

১৯০৩ ১৫ই নভেম্বর তারিখে গভর্ণমেণ্টের চাকরী হতে অবসর গ্রহণ। ময়ূরভঞ্জ রাজ্যের খনিজ সম্পদের অনুসন্ধান-কর্তা নিযুক্ত হলেন।

১৯০৪ গরুমহিষানী-পর্বতগাত্রে প্রচুর লৌহ-খনিজ আবিষ্কার করলেন—জামশেদপুরে টাটার কারখানা সৃষ্টির প্রারম্ভ সূচিত হল।

১৯০৬ বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনষ্টিটিউটের সৃষ্টি। ১৯০৬-১৯২০ সন পর্যন্ত তার অবৈতনিক অধ্যক্ষ। খনিজ সম্পদের সন্ধানে কাথিওয়াড় গমন।

১৯০৭ খনিজ সম্পদের সন্ধানে কাশ্মীর গমন। রাঁচীতে গৃহনির্মাণ ও সেখানে বসবাস আরম্ভ।

১৯১২ The Indian Prospecting Co. Ltd. খুললেন।

১৯১৬ বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনে (১৩২৩ সাল, যশোহর) বিজ্ঞান শাখার সভাপতি নির্বাচিত হলেন। বাংলা ভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞান শিক্ষা প্রদানের প্রস্তাব।

১৯২১ কুশদহ সমিতির বার্ষিক সভার সভাপতি হলেন।

১৯৩৪ ২৭শে এপ্রিল শুক্রবার, রাঁচীতে স্বগৃহে মৃত্যু, ৭৯ বৎসর বয়সে।

১৯৩৮ ১৩ই মার্চ জামশেদপুরে প্রমথনাথের মর্মর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত।

আচার্য প্রমথনাথ বসু

ভূমিকা

এদেশে যে বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া খুব দরকার তা বাঙ্গালাদেশের জননেতারা বুঝেছিলেন প্রায় দেড়শ বছর আগে। তাঁরা নিজেরা বিজ্ঞানসেবা করতেন ও তা প্রচারের জন্য বই, পত্রিকা ইত্যাদি প্রকাশ করেছিলেন মাতৃভাষায়। তারপর রামমোহনের নেতৃত্বে গভর্ণমেণ্টকে ধরেছিলেন (১৮২৩ সন) স্কুল কলেজে বিজ্ঞান শিক্ষা দেবার জন্য।

ক্রমে এদেশে উন্নততর বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যবস্থা হতে থাকে। পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানানুযায়ী চিকিৎসকদের মধ্যে গুডিভ চক্রবর্তী, মহেন্দ্রলাল সরকার প্রভৃতি হলেন বাঙ্গালাদেশের সেই প্রথম যুগের দিকপাল।

অদ্ভুত মানুষ এই মহেন্দ্রলাল সরকার। পিতৃমাতৃহীন সম্বলশূন্য এই বালক মেধা ও মনোবলের গুণে সারাভারতে চিকিৎসা ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে একটি মস্ত স্থান করে নিয়েছিলেন। Indian Association for the Cultivation of Science তিনিই গড়েছিলেন জ্ঞান, কর্ম ও সেবায়; তার ইতিহাস মনোরঞ্জনবাবু ইতিমধ্যেই প্রকাশ করেছেন।

১৯৫৮ সনে আমরা আচার্য জগদীশচন্দ্রের জন্মশতবর্ষপূর্তি উৎসব করেছিলাম। গত বৎসর (১৯৬১) আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের জন্মশতবর্ষপূর্তি উৎসব হয়েছে। এঁদের জীবনী আলোচনা করলে একটা মূলগত ঐক্য চোখে পড়বে —সে সময়ে উচ্চাভিলাষী ছাত্রদের মনোভাব। তখন নেতারা বলছেন, শিক্ষা, ধর্ম, সমাজ, পল্লীসংগঠন সবেতেই এগিয়ে চলার জন্য যুবশক্তির দিকে দেশ চেয়ে আছে—এই কথা তাঁদের মনেও সজাগ ছিল। আবার এঁরা নিজেরা যখন নেতা হলেন তখন ছাত্রদের আবার তাই-ই বলেছিলেন। এবং কর্মের দ্বারা সেই আদর্শই রূপায়িত করেছিলেন।

শিক্ষাদ্বারা উপার্জনের সুবিধা হয় সত্য। কিন্তু সেদিনের বাঙ্গালীর মনে উপার্জনই বড় কথা ছিল না। নেতারা জেনেছিলেন, বাঙ্গালাদেশের নিরক্ষরতা নিজেদেরই দূর করতে হবে, শিল্প গড়তে হবে, সমাজের সেবা করতে হবে, সাহিত্যের মধ্যে একটা উন্নতি, অগ্রগতির মহৎ সুর আন্‌তে হবে। পরাধীন

হয়েও সাহসের সঙ্গে তাঁরা এসব কর্মক্ষেত্রে এগিয়েছিলেন। এও তাঁরা বুঝেছিলেন যে দেশে বিজ্ঞানের প্রসার হলে সব রকম উন্নতির সুযোগ মিলবে, সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান ও সত্যানুসন্ধানের পথ সহজ হবে।

বিজ্ঞানের প্রচারের জন্য বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের প্রতিষ্ঠা। আর সেই প্রচার বা শিক্ষাদান যে বাঙ্গালা ভাষাতেই দেওয়া যায় একথা বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ মনে করেন। তাই পরিষদ বিজ্ঞানের নানা বই বাঙ্গালাভাষায় প্রকাশ করে চলেছেন।

বিজ্ঞানীর জীবনী পাঠ করলে তাঁর জীবন ও তাঁর কর্মকেও জানা যায়। তাঁর জীবনের দ্বন্দ্ব ও জয়, তাঁর মনের গতি ও দৃষ্টির ব্যাপ্তি আমাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। স্নেহাস্পদ শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত 'ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার', 'আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু' ও 'আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়'—এই তিন জন বিখ্যাত বিজ্ঞানীর জীবন চরিত লিখেছেন। অতি সুপাঠ্য সহজ ভাষায় তিনি এঁদের জীবনের বহু মনোজ্ঞ তথ্য দিয়েছেন। অল্পপরিসর স্থানের মধ্যে এঁদের সমগ্র জীবনী পেয়ে বাঙ্গালী পাঠকের খুব সুবিধা হয়েছে ও তাই বইগুলিও জনপ্রিয় হয়েছে।

জগদীশচন্দ্র ও প্রফুল্লচন্দ্র উভয়েই দেশবিখ্যাত বিজ্ঞানী। এঁদেরও আগে আর একজন বাঙ্গালী বিলাত থেকে বিজ্ঞানে কৃতবিদ্য হয়ে দেশে ফিরে আসেন, তিনি ভূতত্ত্ববিদ্ প্রমথনাথ বসু। প্রমথনাথের জীবনধারা কালে কালে তাঁকে বাঙ্গালাদেশের পূর্বাচার্যদের সমআসনে উঠিয়েছিল। তাই মনোরঞ্জনবাবুর লেখা এঁরই জীবনী বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ সানন্দে প্রকাশ করছেন।

প্রমথনাথ বসু ধনীর সন্তান ছিলেন না। মেধাই ছিল তাঁর অবলম্বন। আর দৃষ্টি ও কর্মশক্তি ছিল বিজ্ঞানীর। বৃত্তি পেয়ে পেয়েই তাঁর এ দেশে পড়াশুনা; আর গিলক্রাইষ্ট বৃত্তি অর্জন করেই তিনি বিলাতে গিয়েছিলেন (১৮৭৪ খৃঃ)। আট বৎসর পর এই বৃত্তি পেয়েই প্রফুল্লচন্দ্র বিজ্ঞান পড়তে এডিনবরা চলে গিয়েছিলেন।

প্রমথনাথ পেয়েছিলেন ভূতত্ত্ব বিভাগের উচ্চ চাকরী। তখন এদেশে কেবল সাহেবরাই একাজে নিযুক্ত হতেন। ভারতের নানা অংশে ও ব্রহ্মদেশেও তিনি বহু রকম খনিজের আবিষ্কার করেছিলেন। তাঁরই আবিষ্কারের উপর জামশেদপুরের লোহার বিশাল কারখানার পত্তন হয়েছিল। তাঁরই আবিষ্কৃত লৌহের আকরগুলি হতেই আজ দুর্গাপুর, ভিলাই ও রাউড়কেলার কার-

খানাগুলিতে কাঁচামাল যোগান হচ্ছে। যে বেঙ্গল টেকনিকাল কলেজ আজ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয়েছে, প্রমথনাথ বহুদিন এর কর্ণধার ও উপদেষ্টা ছিলেন। বাঙ্গালা ভাষায় বিজ্ঞান শিক্ষা দেবার জন্য ১৮৮৪ সনেই 'প্রাকৃতিক ইতিহাস' (Rudiments of Geology and Physical Geography) শীর্ষক বই তিনি লিখেছিলেন। অত আগেও তিনি বুঝেছিলেন শিক্ষা মাতৃভাষাতেই হওয়া উচিত।

মনোরঞ্জনবাবু অতি নিপুণতার সঙ্গে বিভিন্ন অধ্যায়ে প্রমথনাথের বিচিত্র কর্মবহুল জীবনে এক সুন্দর তথ্যপূর্ণ কাহিনী লিখেছেন। তাঁর দীর্ঘকালেব অনুসন্ধানে বহু খবর প্রকাশ হয়েছে। কেবল ঘটনার বিবরণ নয়, তাঁর জীবনের কর্ম ও সাধনা, ব্যক্তিত্ব ও শক্তি এমন সুন্দর হয়ে ফুটে উঠেছে যে তাঁর জীবনের সাথে সাথে সেই বিগত বরেণ্য যুগটাই সম্মুখে জেগে ওঠে। সেই যুগ, যখন আমাদের পূর্বগামীরা জ্ঞানের রাজ্যে প্রবেশের জন্য উন্মুখ ছিলেন, সত্যান্বেষণের জন্য আত্মস্বার্থে অবহেলা করতেন—দেশের ও দশেরই স্বার্থই নিজের স্বার্থ বলে গণ্য করতেন।

পরাধীন অবস্থায় দেশীয়দের বেশী উপরের চাকরীতে উঠতে দেওয়ার কথা নয়। সেই রীতিতে প্রমথনাথের পথও রুদ্ধ হয়েছিল। তাই ক্ষুব্ধ হয়ে তিনি সরকারী চাকরী ছেড়ে দেন। এর পরই তিনি ময়ূরভঞ্জের ভূতত্ত্ববিদ্ হন। সেখানে তাঁর কাজ বিস্তৃততর ও স্বাধীনতর ক্ষেত্র পেয়েছিল ; সে জন্যই তাঁর গরুমহিষানী লৌহ-আকরের আবিষ্কার সরকারী রিপোর্টেই আবদ্ধ থাকেনি, তিনি টাটাদের ডেকে এনে তা হতে ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ ইস্পাতের কারখানা খোলাতে পেরেছিলেন।

সরকারী চাকরী ছেড়ে দেবার পর জনসেবা ও বিজ্ঞান এবং শিল্পশিক্ষার ক্ষেত্রে তিনি অধিকতর মনোযোগ দিতে পেরেছিলেন। সরকারী চাকরী হতে মুক্তি হলে অনেকেরই জীবনের স্বাভাবিক বিকাশের সুবিধা হয়। প্রফুল্লচন্দ্রেরও তাই হয়েছিল বিজ্ঞান কলেজের অধ্যাপনার কালে। রাসায়নিক গবেষণার ক্ষেত্রে, ছাত্রদের মধ্যে গবেষণার স্পৃহা উন্মেষের কাজে, রসায়ন বিজ্ঞানকে শিল্পক্ষেত্রে প্রয়োগে, দেশের সমাজ-সেবায়, রাষ্ট্রীয় আন্দোলন ও কর্মের মধ্যে আচার্য রায় যেন আরও সহজ স্বচ্ছন্দগতি হয়েছিলেন। সরকারী চাকরী ছাড়ার পর প্রমথনাথের জীবন ও সহজ এবং স্বাধীন পথে চলেছিল। এবং

চিন্তা ও কর্মে স্বদেশ ও স্বধর্মের প্রতি তাঁর অনুরাগ ও গৌরববোধ বেশী করে ফুটে উঠেছিল।

আগে সাহেব নাম অনেক সময় মিললেও অবসর পেয়ে প্রমথনাথ হলেন পুরাপুরি এদেশীয়। সনাতন আদর্শানুযায়ী বাড়ী ও বাগান করে নিভৃতে নিস্পৃহ হয়ে শান্ত ধ্যানময় জীবন যাপন করতেন রাঁচীতে। তা বলে কখনও কল্যাণকর কর্মে তাঁর বিমুখতা দেখা যেত না।

জনসেবার নানা পথ। শিক্ষার বিস্তার, সমাজের কদাচারের দূরীকরণ, দুঃখ মোচন ও রাজনৈতিক জীবনে সৎপথের ইঙ্গিত—সবই প্রমথনাথের শেষ জীবনের কার্যের মধ্যে দেখতে পাই। তাই Leaders of Behar পুস্তকে এই রাঁচী প্রবাসী বাঙ্গালীর জীবন-কথা শ্রদ্ধার আসন পেয়েছে।

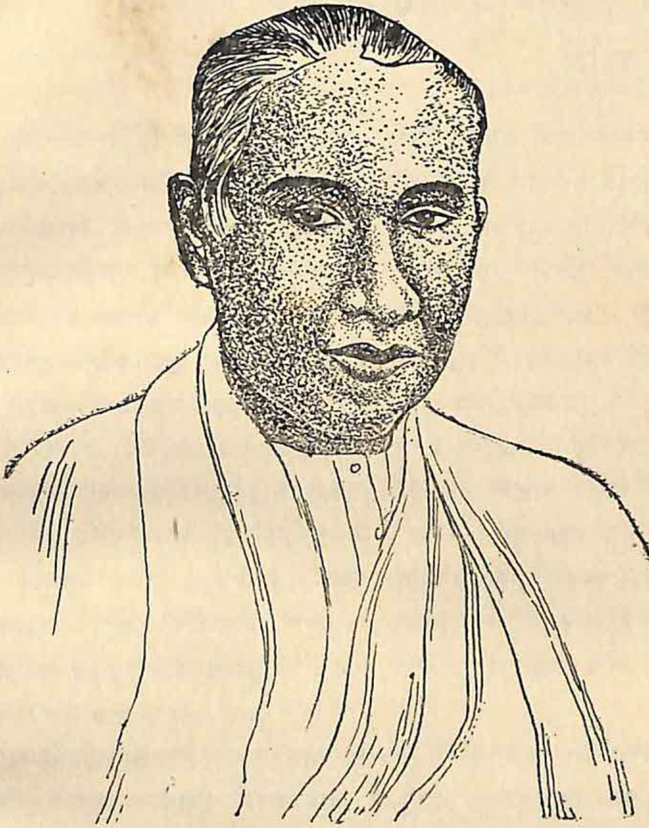
শিল্প ও ব্যবসায়ে বাঙ্গালী পেছিয়ে আছে বলে আচার্য রায় দুঃখ করতেন। আজও সে অবস্থার বিশেষ বদল হয়নি। তবে সে যুগের বাঙ্গালী ছিলেন আদর্শবাদী—তাঁদের সাধনার ইতিহাস আজ বাঙ্গালীর গৌরবের কাহিনী হয়ে রয়েছে। ব্যবসায়ে প্রতিষ্ঠা লাভ না করেও তাঁরা দেশ-আরাধনার যে বাতি জালিয়ে ছিলেন তা সারা ভারতকে পথ দেখাচ্ছে।

রামমোহন, ঈশ্বরচন্দ্র, কেশবচন্দ্র, বিবেকানন্দ, আচার্য রায়, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি তখনকার দিনে যুবকদের সামনে দীপশিখার মত জলেছিলেন। বিজ্ঞানের ক্ষেত্র ছাড়াও স্বদেশের প্রতি মমতায় ও সত্যান্বেষীর আসনে ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার, আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু, প্রমথনাথ বসু প্রভৃতি আদর্শ স্থানীয় মানুষ। এঁদের সঙ্গে এযুগের ছাত্র-ছাত্রীদের পরিচয় হওয়া দরকার। হয়ত এইভাবেই তারা এই যুগসন্ধিক্ষণে পথ-নির্দেশ পাবে।

ছেলেমেয়েদের এখন ভাবতে হবে কি করে দেশের সম্পদ বাড়াতে পারবে। জীবন গড়ে তুলতে গেলে আদর্শ দরকার এবং আদর্শই মূল-মন্ত্র। তাই যাঁরা এদেশে কর্ম ও সাধনার পথে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছেন সেই সব প্রকৃত কর্মীর কথা আমাদের জানা দরকার। অন্যান্য সাধকদের জীবনীর মত, মনোরঞ্জনবাবুর এই আদর্শবাদী বিজ্ঞানীর জীবনী আশা করি পাঠকদের সমাদর লাভ করবে।

৭ই নভেম্বর, ১৯৬২

সত্যেন বোস



জন্ম ঃ   **প্রমথনাথ বসু**   মৃত্যু ঃ

১২ই মে, ১৮৫৫   ২৭শে এপ্রিল, ১৯৩৪

আচার্য প্রমথনাথ বসু

প্রারম্ভ কথা

এদেশে ইংরাজী শিক্ষা প্রবর্তনের প্রথম যুগেই বিজ্ঞান শিক্ষা দেবার জন্য রাজা রামমোহন রায় বড়লাট লর্ড আমহার্ষ্টের কাছে আবেদন করেছিলেন (১১ ডিসেম্বর, ১৮২৩)—"অঙ্ক, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, রসায়ন, শারীরবিদ্যা ও অন্য ব্যবহারিক বিজ্ঞান—যা ইউরোপীয় জাতিদের পৃথিবীর অন্য সব অধিবাসীদের চাইতে উন্নত করেছে—সেই শিক্ষা আমাদের দিন। উপযুক্ত ইউরোপীয় শিক্ষক এজন্য নিয়োজিত হউন এবং পরে ভারতীয়দের ইউরোপ হতে শিক্ষিত করে এনে বিজ্ঞানের অধ্যাপক নিযুক্ত করা হোক।"

ভারত গভর্নমেণ্ট হিন্দু কলেজে কেবল রসায়ন শিক্ষার ব্যবস্থা করলেন। এই সময় শ্রীরামপুরের মিশনারী কলেজেও কিছু কিছু বিজ্ঞান পড়ান আরম্ভ হল। কিন্তু তাতেই বাঙ্গালীরা নিরস্ত হননি। স্বদেশীয়দের বিজ্ঞান পরিবেশনের জন্য 'বিজ্ঞান সেবধি' (১৮৩২), 'বিজ্ঞান সার সংগ্রহ' (১৮৩৩) প্রভৃতি বাঙ্গালা পত্রিকা প্রকাশিত হতে লাগল। রামমোহনের 'সম্বাদ কৌমুদী'তেও বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ সাদরে প্রকাশিত হত। এইভাবে বিজ্ঞানের প্রতি শ্রদ্ধা ও আকর্ষণ সৃষ্টি হতে লাগল।

মেধাবী রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও ডাঃ গুডিভের শিষ্য স্থর্য চক্রবর্তী মেডিক্যাল কলেজে প্রবেশ করলেন। দ্বারকানাথ ঠাকুরের অর্থানুকূল্যে সেখানকার দুইজন ছাত্র উন্নততর শিক্ষালাভের উদ্দেশ্যে বিলাতে চলে গেলেন। হিন্দু-কলেজের উজ্জ্বল রত্ন মহেন্দ্রলাল সরকার বিজ্ঞানে আকৃষ্ট হয়েই ১৮৫৪ সনে সেখানে প্রবেশ করলেন এবং কালে কালে তাঁর হাতেই ১৮৭৬ সনে 'ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান সভা' (Indian Association for the Cultivation of Science) প্রতিষ্ঠিত হল।

বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য বাঙালীর তখন বিশেষ আগ্রহের সৃষ্টি হয়েছে। এদেশে বিজ্ঞান শিক্ষার যে সুযোগ তখন পর্যন্ত ছিল তাতেই মেধাবী ছাত্রগণ

আর তৃপ্তি মানতেন না। তাঁরা বিদেশে যাওয়া আরম্ভ করলেন। প্রসন্নকুমার রায় (Dr. P. K. Roy ; পরে প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যক্ষ হয়েছিলেন) ও অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় (সরোজিনী নাইডুর পিতা ; বরদার শিক্ষা বিভাগের কর্তা হয়েছিলেন) এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মান্য উপাধি অর্জন করলেন। তারপরই গিলক্রাইষ্ট বৃত্তি পেয়ে প্রমথনাথ বসু বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য ১৮৭৪ সনে বিলাতে চলে গেলেন। ৬ বৎসর পর বিবিধ বিজ্ঞানশাস্ত্রে পারদর্শী হয়ে এবং ভারত গভর্নমেণ্টের ভূতত্ত্ব বিভাগের উচ্চ কর্মে নিযুক্ত হয়ে দেশে ফিরলেন।

তারপর গেলেন গিরিশচন্দ্র বসু (বঙ্গবাসী কলেজের স্থাপয়িতা)—বিলাতে উদ্ভিদবিদ্যা ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে উৎকৃষ্ট ছাত্ররূপে গণ্য হলেন। লণ্ডনে ডাক্তারী পড়বার জন্য জগদীচন্দ্র বসু ১৮৮০ সনে সেখানে চলে গেলেন। পদার্থ বিজ্ঞানের নানা উপাধি নিয়ে ফিরে এসে তিনি কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে ইম্পিরিয়াল সার্ভিসে পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপক নিযুক্ত হলেন (১৮৮৫)। বিলাতে শিক্ষিত বৈজ্ঞানিক ছাত্র এদেশের বিজ্ঞানের অধ্যাপক হবেন, রাজা রামমোহন রায়ের সে-স্বপ্নের সাফল্যের প্রারম্ভ সূচিত হল।

প্রমথনাথের স্বদেশ প্রত্যাগমনের দুই বৎসর পর ১৮৮২ সনে গিলক্রাইষ্ট বৃত্তি নিয়ে প্রফুল্লচন্দ্র রায় রসায়ন পড়তে এডিনবার্গ চলে গেলেন। ফিরে এসে তিনিও প্রেসিডেন্সি কলেজেই অধ্যাপক হলেন (১৮৮৯)। বাঙ্গালা দেশে বিজ্ঞান চর্চার এইভাবেই আরম্ভ ; তা হতেই দিকে দিকে নানা কর্মের সৃষ্টি আজ আমরা দেখছি।

'ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার', 'আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু' ও 'আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের' জীবনীগুলিতে এই বিজ্ঞানসাধকদের কর্মধারা ও তাঁদের জীবনের বৈশিষ্ট্য স্বল্পায়তন মধ্যে পাওয়া যাবে। আচার্য প্রমথনাথের জীবনের কার্য ও চিন্তা অনুসরণ করে এই বিজ্ঞান সাধকের একটি চরিত কথা চিত্রিত করার চেষ্টা করছি। এই চারজনের জীবনই একটি যুগের অন্তর্গত। সে-যুগ বাঙ্গালীর কীর্তির, বাঙ্গালীর গৌরবের। দেশপ্রেম ও জাতীয়তার মনোভাব এই চারজন মনীষীর জীবনকেই উদ্দীপিত ও পরিচালিত করত ; ভারতের উন্নতি ছিল তাঁদের সাধনা এবং স্বাধীনতা ছিল তাঁদের স্বপ্ন। সেই স্বপ্ন আজ সফল হয়েছে। আমরা তাঁদের জীবন-সাধনার ফল ভোগ করছি। কিন্তু যে উৎস হতে তাঁরা দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধের সঞ্জীবনীধারা পান করে

উদ্বোধিত হতেন তা আজ বাঙ্গালীর কাছে বুঝিবা হারিয়ে গেছে। এদের জীবন কথা বার বার পাঠ করলে হয়ত সেই উৎস ধারার আবার সন্ধান পাওয়া যাবে।

জন্ম ও বাল্যকথা

২৪ পরগনা জেলার গৈপুর গ্রামে ১৮৫৫ সনের ১২ই মে তারিখে প্রমথনাথ বসুর জন্ম। পিতা তারাপ্রসন্ন, মাতা শশিমুখী। তাঁর তিন বোন; ক্ষীরোদা, হেমনলিনী ও যাদু! পাঁচ ভাই; মন্মথ, উপেন্দ্র, সুরেন্দ্র, কুমুদ ও অমিয়। এই ভাই বোনদের মধ্যে কেবল ক্ষীরোদা তাঁর চাইতে বড়।

পিতা তারাপ্রসন্ন জলপুলিসের ইনস্পেক্টর ছিলেন এবং পিতামহ নবকৃষ্ণ ছিলেন কৃষ্ণনগরের বিখ্যাত মোক্তার। নবকৃষ্ণের উর্দ্ধতন পঞ্চম-পুরুষ কবিরাজ বসু গৈপুরের দত্ত (মজুমদার) পরিবারে বিবাহ করে সেখানেই বসতি স্থাপন করেন। নদীয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র তাঁকে বিশ বিঘা নিষ্কর জমি দান করে এই বসতি স্থাপনে সহায়তা করেন। ১৮২৩ সনে প্রদত্ত দানপত্রে একথার উল্লেখ আছে।

২৪ পরগনা জেলার গোবরডাঙ্গা বিখ্যাত স্থান। তার পার্শ্বেই যমুনা-নদীর পূর্বতীরে এই গৈপুর। গোবরডাঙার পার্শ্ববর্তী আর একটি বিখ্যাত গ্রাম হল খাঁটুরা। বস্তুত কুশদহ পরগনায় এই তিনটি গ্রামই প্রসিদ্ধ। যমুনা নদী পূর্বদিকে গিয়ে ইছামতীর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে, আর তার পশ্চিমপ্রান্ত ভাগীরথীর সঙ্গে মিলেছে। এই সঙ্গমস্থলের পশ্চিম পাড়েই হিন্দুতীর্থ ত্রিবেণী। সেখান হতেই তৃতীয় স্রোত সরস্বতী বহির্গত হয়ে হুগলী, বর্ধমান ও হাওড়া জেলার উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে আবার কলকাতার দক্ষিণে ভাগীরথীতে রাজগঞ্জের কিছু উত্তরে যুক্ত হয়েছে।

এই ত্রিবেণীর দুইটি স্রোত—যমুনা ও সরস্বতী প্রমথনাথের শৈশব ও কৈশোরে স্রোতবাহী নদী ছিল। সেই স্রোত দুই দিকের ভূভাগকে শস্যশালিনী করেছিল এবং বহু পণ্যবাহী নৌকা এই স্রোত দুটিতে চলাচল করে দেশটিকে সমৃদ্ধ করত। তারপর হতে দুটি নদীই মজে এসেছে, ভূমি আর অত শস্য দেয়

না, জল নিষ্কাশনের অভাবে চতুর্দিকে ম্যালেরিয়া ও অন্য রোগের প্রাদুর্ভাব হয়েছে, পণ্য ও যাত্রীবাহী নৌকা আর দেখা যায় না। স্বাধীনতার পর হতে এই স্রোত দুইটিকে পুনর্জীবিত করার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার অর্থব্যয় করছেন, কিন্তু এখনও পূর্বঅবস্থা ফিরে আসেনি।

এখন হতে প্রায় একশত বৎসয় আগে স্রোতশালিনী সেই যমুনা নদীর তীরবর্তী গৈপুরে প্রমথনাথ জন্মেছিলেন। তখনকার সেই গ্রাম, তার মানুষ তাঁদের জীবনযাত্রা, তাদের শিক্ষাদীক্ষার অনেক পরিবর্তন আজ হয়েছে। তখন গৃহস্থদের গোলায় ধান, পুকুরে মাছ, গাছে ফল—জীবনকে সহজ ছন্দে প্রবাহিত করত—খেজুর গাছ হতে যে গুড় হত তা কতক খাওয়া হত—বাকীটা বিক্রী করে নগদ টাকা হত। নিজের গরুর দুধ, ক্ষেতের সরিষার তৈল, গ্রামের তাঁতির বোনা কাপড় সবাই ব্যবহার করতেন।

রোগও বড় হত না ; সর্বৌষধি সূর্যালোক ও সূর্যতাপ এবং বিশুদ্ধ বাতাসে সকলের শরীর সুস্থ ও সতেজ থাকত। কোন ডাক্তার ছিলেন না, কবিরাজ দেখা যেত ক্বচিৎ—বাড়ীর মেয়েরাই গাছগাছড়ার গুণাগুণ জানতেন এবং অতিমাত্রায় ব্যস্ত না হয়ে সহজেই তা দিয়ে রোগ সারাতেন। সবাই সুস্থ ও দীর্ঘজীবী হতেন। প্রমথনাথের মাতৃদেবী আশী বৎসর বেঁচেছিলেন।

প্রনথনাথ প্রায় ৭৫ বৎসর বয়সে এক স্মৃতিকথা লিখে গেছেন। তাতে এইসব বিবরণ সানন্দে বর্ণনা করেছেন। যশোহর জেলার সুন্দরপুরের সম্পন্ন গৃহস্থ বীরেন্দ্রনারায়ণ মিত্র তাঁর মাতামহ ছিলেন। নিজ জোতের কৃষিজাত দ্রব্য হতেই সংসারে আহার্য ও ব্যবহারের সব প্রয়োজন মিটত। সেকালে গ্রামবাসীদের আনন্দের অনেক উপকরণ ছিল। দুর্গাপূজা, নৌকাবাচ, ছোট ও বড় ঘুড়ি ওড়ান, হাডুডু খেলা ও ডাণ্ডাগুলি। লেখাপড়া অল্প লোকে করত, কিন্তু যাত্রা গান, কথকতা প্রভৃতির দ্বারা রামায়ণ ও মহাভারতের কাহিনী ও শিক্ষা অক্ষরপরিচয়হীন স্ত্রী-পুরুষ সকল স্তরের মধ্যে প্রবাহিত হত। হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে বিদ্বেষ তখনও দেখা দেয়নি। বাড়ীর একটি মুসলমান ভৃত্যকে প্রমথনাথ 'কাকা' ডাকতেন।

গ্রামের এই আনন্দগুলিতে প্রমথনাথ যোগ দিতেন—এই খেলা, এই যাত্রা গান, এই নৌকাবাচ। অল্প বয়সেই তাঁর শরীর দৃঢ় হল এবং বাঙ্গালীর সমাজ ও ধর্মানুষ্ঠানের তত্ত্ব তাঁর কিশোর মনের উপর গভীর রেখাপাত করল। উত্তরকালে এই জ্ঞান তাঁর জীবনকে নানাভাবে প্রভাবিত করেছিলে।

বিদ্যাশিক্ষা আরম্ভ

পার্শ্ববর্তী গ্রাম খাঁটুরার মডেল স্কুলে (বঙ্গ বিদ্যালয়) তাঁর বিদ্যাশিক্ষা আরম্ভ হল। ইংলণ্ডস্থিত শিক্ষাকর্তাদের ১৮৫৪ সনের বিখ্যাত নির্দেশ অনুযায়ী (Education Despatch) বাংলা গভর্ণমেণ্ট তখন বাংলাভাষার শিক্ষা প্রদানের জন্য এইসব মডেল স্কুল খুলেছিলেন। এই কাজে সহকারী ইন্সপেক্টর রূপে দক্ষিণবঙ্গের কর্মভার পেয়েছিলেন পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। ১৮৫৫ সনের মে মাসে প্রমথনাথের জন্ম হয়, এবং সেই সনের আগষ্ট মাসে খাঁটুরায় বিদ্যাসাগর মহাশয় একটি বঙ্গবিদ্যালয় খুলে দেন।

এই বিদ্যালয়েই প্রমথনাথ যথাসময়ে ভর্তি হলেন। এবং নয় বৎসর বয়স অবধি সেখানেই তাঁর পড়াশুনা চলল। গোবরডাঙা, গৈপুর ও খাঁটুরা অঞ্চলে সংস্কৃতবিদ্যার চর্চা বহুকালের। সম্ভবত নবদ্বীপের নৈকট্য হেতুই অঞ্চলটিতে বৈষ্ণব ধর্ম ও অনুষ্ঠান খুব প্রচলিত। এইভাবে যে শিক্ষার প্রভাব এখানে গড়ে উঠেছিল তাতে আকৃষ্ট হবেই ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বঙ্গবিদ্যালয় স্থাপনের জন্য খাঁটুরাকে উপযুক্ত স্থান বলে গণ্য করেছিলেন।

এই বঙ্গবিদ্যালয়ের সব পড়া মাতৃভাষায় সুতরাং গোড়ার পড়া তার খুব পাকা হল এবং মাকে ছেড়ে থাকার মত বয়স হলেই, মাত্র ৯ বৎসর বয়সে পিতামহ নবকৃষ্ণের কাছে তিনি কৃষ্ণনগরে চলে গেলেন। পিতা তারাপ্রসন্নকে জলপুলিসের কাজে প্রায়ই বাইরে থাকতে হত ; তাই তিনি পুত্রকে নবকৃষ্ণের কাছে পাঠানই সঙ্গত মনে করলেন। প্রমথনাথ একদিন বাড়ীর কাছে এক পুকুরে হাবুডুবু খেয়েছিলেন। তাই আর তাঁকে গৈপুরে রাখলেন না।

কৃষ্ণনগরে বিদ্যাশিক্ষা

এখন গৈপুর ২৪ পরগনা জেলার অন্তর্গত হয়েছে ; প্রমথনাথের জন্মের সময় তা নদীয়া বিভাগে ছিল। নদীয়ার রাজধানী কৃষ্ণনগর বাঙলাদেশের জ্ঞানচর্চা ও কৃষ্টির ক্ষেত্রে চিরদিনই দীপ্যমান। নবযুগের প্রভাবে ক্রমে কৃষ্ণনগরে ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হল। ১৮৪৮ সনে সেখানে কলেজ স্থাপিত হলে বিখ্যাত শিক্ষাবিদ ডি. এল. রিচার্ডসন ও রামতনু লাহিড়ী প্রভৃতি সেখানে

এসে ছাত্রদের মধ্যে উন্নতি-চিন্তা, কুসংস্কার মোচনের ইচ্ছা ও স্বদেশপ্রেম প্রবিষ্ট করে দিলেন। গ্রাম হতে এসে প্রমথনাথও এই প্রভাবে উদ্বোধিত হলেন।

একবার দেশের বাড়ীতে গিয়ে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনকে দেখে এলেন। সুধাকণ্ঠি ত্রৈলোক্য সান্ন্যালকে সঙ্গে করে তিনি খাঁটুরায় ধর্মপ্রচারে এসেছিলেন। ফিরে এসে প্রমথনাথ কৃষ্ণনগরের ব্রাহ্মসমাজে যেতে আরম্ভ করলেন।

প্রমথনাথের কিশোর মনে তখন নানা পরিবর্তন এসেছে। হাডুডু ছেড়ে তখন ক্রিকেট খেলা সুরু হল। এখন গায়ে শার্ট উঠল, পায়ে জুতা; হিন্দুদের নিষিদ্ধ খাদ্যও খাওয়া হত। মুরগী খাওয়ার অভ্যাস হল, বন্ধুদের সাথে কোন মুসলমান সহপাঠীর বাড়ীতেই।

ক্লাসে উৎকৃষ্ট ফল করে করে প্রমথনাথ স্কুলের সর্বোচ্চশ্রেণীতে উঠলেন। কিন্তু তখন তাঁর মাত্র ১৫ বৎসর বয়স হল। তখনকার দিনে ১৬ বৎসর না হলে এনট্রান্স পরীক্ষা দেওয়া যেত না। প্রমথনাথ এই একটি বছর বাইরের বই পড়ে কাটালেন, আর লিখলেন কবিতা। কবিতাগুলি নিয়ে কলকাতা চলে গেলেন। একখানি বই ছাপা হল (১৮৭১)—'অবকাশ কুসুম' ২৭ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত—শৈব্যার বিলাপ, তপোবনে ও শ্মশানে, ইংলণ্ড গমনের সময়ে কেশবচন্দ্র সেনের প্রতি, জীবন Longfellowর Psalms of life-এর অনুবাদ), বঙ্গবিধবা, কুমুদিনীর সাহস। শ্মশানের চিত্রের একাংশ এইরূপ—

ছড়াছড়ি শ্বেত অস্থি; কঙ্কাল নিকর,
অসম্পূর্ণ দগ্ধ বাঁশ; ভস্ম রাশি রাশি;
শেষ এই দশা ভব-যাত্রী সবাকার
কি কুটীরবাসী কিবা প্রাসাদনিবাসী—
কি সুখ-সম্পদ-সুতা, কি শোক-বিবশা,—
শ্মশান সঙ্গমে শেষে সবার এ দশা!
সুমার্জিত-কান্তি-তেজঃ, অসিত বরণ,
পদ, মান সমভাবে মিশায় শমন!

এই কিশোর বয়সেই তাঁর ভাষা ও ভাবের উপর যে অনেকখানি দখল হয়েছিল, তা দেখা যাচ্ছে।

এই বাইরের পড়া ও কবিতা লেখা তাঁকে এতখানি তন্ময় করেছিল যে আগামী বৎসরেরের পরীক্ষা যখন এগিয়ে এল তখন খেয়াল হল যে, পাঠ্যপুস্তক আবার ভাল করে পড়া দরকার। সে পড়া বড় গুরুতর পড়া হল। তিনি

অসুস্থ হয়ে পড়লেন এবং পরীক্ষার অল্প আগে সুস্থ হলেন। কিন্তু এত দুর্বল ছিলেন যে, পাল্কী করে পরীক্ষা-কেন্দ্রে যেতে হল। পরীক্ষার ফল প্রকাশ হলে দেখা গেল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছেন। পিতামহ নবকৃষ্ণ এর পর আর অল্পদিন বেঁচেছিলেন।

কলেজের পড়া

১৮৭২ সনে প্রমথনাথ কৃষ্ণনগর কলেজে ভর্তি হলেন। এই বিখ্যাত কলেজটির তখন আরও উন্নতি হয়েছে। ১৮৬৪ সন হতে সেখানে আইন পড়ান আরম্ভ হয়েছে এবং কেম্ব্রিজের বিখ্যাত ছাত্র সামুয়েল লব সেখানে অধ্যক্ষ হয়ে এসেছেন। অল্পদিনেই প্রমথনাথ মেধা ও সুব্যবহারের দ্বারা কলেজের কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। পর বৎসরই তিনি স্থির করলেন, গিলক্রাইষ্ট বৃত্তির জন্য প্রতিযোগিতা করবেন। বিলাতে গিয়ে বিজ্ঞান পড়া চাই। এই সময় তিনি ও তাঁর সহপাঠীরা বিজ্ঞানের স্বাদ পেয়েছিলেন। কারণ এই বৎসরই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আইন করেন যে, ফার্ষ্ট আর্টসে বিজ্ঞান পড়তে হবে এবং বিখ্যাত অধ্যাপক অম্বিকাচরণ সেন তখন কৃষ্ণনগর কলেজে রসায়ন পড়িয়ে ছাত্রদের এই বিষয়ের প্রতি খুব আকৃষ্ট করেছিলেন।

গিলক্রাইষ্ট বৃত্তি ১৮৬৭।৬৮ সন হতে প্রবর্তিত হয়। ভারতবর্ষীয় মেধাবী ছাত্রদের উচ্চ শিক্ষার জন্য বিদেশে গমনের সাহায্যার্থে এর সৃষ্টি। বৎসরে দুইটি করে বৃত্তি, প্রতিজনে পাঁচ বৎসর জন্য বার্ষিক একশত পাউণ্ড এবং লণ্ডনে যাতায়াত জন্য পথ খরচ আর একশত। কলকাতা, মাদ্রাজ ও বোম্বাইতে একসঙ্গে পরীক্ষা হত।

প্রমথনাথ স্থির করলেন, এই বৃত্তির জন্য ১৮৭৪ সনে পরীক্ষা দেবেন। সুতরাং ফার্ষ্ট আর্টস পরীক্ষা ও বৃত্তির জন্য পড়া একসঙ্গেই চলল। বৃত্তির জন্য অতিরিক্ত পড়তে হল প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও ল্যাটিন ভাষা। অধ্যাপক সেনের যত্নে বিজ্ঞান পড়ার খুব সুযোগ হল—কেবল ক্লাসে নয়, তাঁর বাড়ীতে গিয়েও। লব সাহেব তাঁকে ল্যাটিন পড়িয়ে তৈরী করে তুললেন। পরবর্তী জীবনে এই দুইজন সহৃদয় অধ্যাপকের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে প্রমথনাথ সর্বদা আনন্দ প্রকাশ করতেন।

১৮৭৩ সনের ডিসেম্বর মাসে প্রমথনাথের ফাষ্ট আর্টস পরীক্ষা হল। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি পঞ্চম স্থান অধিকার করলেন। অধ্যক্ষ লব রিপোর্টে লিখলেন, "আরও ভাল ফলের আশা করেছিলাম ; কারণ আমার এতদিনের অভিজ্ঞতায় তার চাইতে ভাল ইংরাজী লিখিয়ে ছাত্র আর দেখিনি।"

প্রমথনাথ অতঃপর কোথায় পড়বেন, এক সমস্যার উদয় হল। ছোটলাট ক্যাম্বেল সাহেবের উৎসাহেই কলেজগুলিতে বিজ্ঞান পড়ান স্থির হয়, কিন্তু তিনিই স্থির করেন যে, উচ্চশিক্ষার জন্য গভর্নমেণ্ট বেশী ব্যয় করার ফলে প্রাথমিক শিক্ষা প্রচারে অর্থের অকুলন হচ্ছে। এই যুক্তিতে বহরমপুর কলেজ, কৃষ্ণনগর কলেজ ও সংস্কৃত কলেজ হতে বি. এ. ক্লাস উঠিয়ে দেওয়া হল। অগত্যা প্রমথনাথ কলকাতায় এসে সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজে ভর্তি হলেন। গত পরীক্ষায় পঞ্চম হয়ে তিনি যে পঁচিশ টাকা মাসিক বৃত্তি পেয়েছিলেন তাতেই তাঁর সকল রকম ব্যয় সঙ্কুলন হত। এখানে তিনি একজন ফরাসীবিদ্ অধ্যাপকের কাছে সেই ভাষা শিখতে থাকেন। কিন্তু এই পড়া তাঁর বেশী দিন চলেনি। ১৮৭৩ সনের ডিসেম্বর তিনি ফাষ্ট আর্টস পরীক্ষা দিয়ে পরের মাসেই গিলক্রাইষ্ট বৃত্তি পরীক্ষা দেন। এই পরীক্ষার ফল মে মাসে (১৮৭৪) প্রকাশিত হলে দেখা গেল, তিনি প্রথম হয়েছেন।

এর পর তিনি বিলাতের আদবকায়দা, চালচলন, কথাবার্তা ও আহারাদি শিখতে মাস তিনেক কাটালেন। তারপর সেপ্টেম্বর মাসে জাহাজে করে ইংলণ্ড রওনা হলেন। বিলাতে যাওয়ার হাতেখড়ি দিতে বিখ্যাত ব্যারিষ্টার মনোমোহন ঘোষ খুব সাহায্য করেছিলেন ; প্রমথনাথকে পূর্বোক্ত তিনমাসের অনেক দিনই তিনি নিজের বাড়ীতে এনে রেখেছিলেন।

পিতামাতা প্রমথনাথের এই উচ্চশিক্ষার আকাঙ্ক্ষা সমর্থন করলেন। ব্যয় নির্বাহের সামর্থ তাঁদের ছিল না। কিন্তু সে অর্থ তো ছেলেই বৃত্তিদ্বারা অর্জন করেছে।

বিলাতে পড়াশুনা

প্রমথনাথ বিলাতে পৌছলেন ১৮৭৪ সনের অক্টোবর মাসে এবং লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. এস-সি ক্লাসে ভর্তি হলেন। কিন্তু ভর্তি হবার আগে তাঁকে

এনট্রান্স পরীক্ষায় পাশ করে নিতে হল। তাঁর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এফ. এ. পাশ ও গিলক্রাইষ্ট বৃত্তিলাভ—লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের এনট্রান্সের সমতুল্য বিবেচিত হল না। ৮ বৎসর পর (১৮৮২) আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় এফ. এ. পাশ করে গিলক্রাইষ্ট বৃত্তি নিয়ে এডিনবার্গে বি. এস-সি পড়তে গিয়েছিলেন। তখন তাঁকে আর সেখানে এনট্রান্স পরীক্ষা দিতে হয়নি।

লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া আরম্ভ হল,—রসায়ন, উদ্ভিদবিদ্যা, ভূতত্ত্ব, জীববিদ্যা, প্রাকৃতিক ভূগোল, তর্কশাস্ত্র ও দর্শন। ১৮৭৭ সনে ডাক্তারী ছাত্রদের বিজ্ঞান-পরীক্ষার সঙ্গে যে পরীক্ষা তাঁদের হল তাতে তিনি উদ্ভিদবিদ্যায় প্রথম হলেন এবং জীববিদ্যায় চতুর্থ। পরের বৎসর (১৮৭৮) বি. এস-সির শেষ পরীক্ষায় তিনি উদ্ভিদবিদ্যায় দ্বিতীয় এবং জীববিদ্যা ও প্রাকৃতিক ভূগোলে তৃতীয় হলেন।

এইসব গুরুতর পড়াশুনার মধ্যেই তিনি ১৮৭৭ সনে ভারতের আর্যসভ্যতা সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ লিখে Oriental Congress-এর প্রতিযোগিতায় নেমেছিলেন। এই বিদ্বৎমণ্ডলীর বিচার অনুযায়ী ইটালীয় গভর্নমেণ্ট তাঁকে পুরস্কৃত করেন।

গিলক্রাইষ্ট বৃত্তি শেষ হবার কথা ১৮৭৯ সনের অক্টোবর মাসে। সুতরাং হাতে সময় পেয়ে তিনি রয়াল স্কুল অব মাইনস্-এ ভর্তি হলেন। এখানে খনিবিদ্যা ছাড়াও অন্য বিজ্ঞান পড়ান হত এবং পরে এই কলেজেই 'রয়াল কলেজ অব সায়েন্স' নাম পেয়েছিল। এই কলেজের পরীক্ষায় তিনি প্রাণবিদ্যা ও প্রত্নজীববিদ্যায় প্রথম হলেন। এতে তাঁর এডোয়ার্ড ফরবেশ পদকও পুরস্কার পাবার কথা। কিন্তু তিনি পূর্বে ঐ কলেজের ছাত্র ছিলেন না বলে পূর্বে যে সব বিষয়ে এখানে পাশ করে নেবার রীতি ছিল সেসব বিষয়ে পরীক্ষিত না হওয়াতে নিতান্তই আইনের সূক্ষ্ম বিচারে তিনি তা পেলেন না। পৃথিবীখ্যাত অধ্যাপক জুলিয়ান হাকস্‌লি এখানে প্রাণবিদ্যা পড়াতেন ; তাঁর চিত্তাকর্ষক বক্তৃতাই প্রাণবিদ্যার দিকে তাকে এত আকৃষ্ট করেছিল। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় ভূতত্ত্বের পরীক্ষায় তিনি পুরস্কার পেরেছিলেন এবং রয়াল স্কুল অব মাইনস্-এও এই বিষয়ের পরীক্ষায় এত ভাল নম্বর পেয়েছিলেন যে, মারচিসন পুরস্কার তিনি পেতেন যদি এখানে তিনি ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষা পাশ করে ঢুকতেন।

বিলাতে অবস্থান ও চাকুরীর চেষ্টা

প্রমথনাথ নানারূপ বিজ্ঞানশাস্ত্রে পারদর্শী হলেন। কিন্তু তাঁর পরিবারের এত ধন ছিল না যে, এসব জ্ঞানকে কোন স্বাধীন ব্যবসায়ে প্রয়োগ করা যায়। সুতরাং চাকরীই তাঁকে করতে হবে। এবং সে ভাল চাকরী গভর্নমেণ্ট ছাড়া তাঁকে কে দেবে? তিনি ভারতের সেক্রেটারী অব ষ্টেটস্‌কে ধরলেন। কিন্তু সেখানে হতে সাড়া পাওয়া গেল না। ১৮৭৯ সনের অক্টোবর মাসে গিলক্রাইষ্ট বৃত্তি শেষ হয়ে গেল। তবু চাকরী না নিয়ে দেশে ফিরে আসা তাঁর সঙ্গত মনে হল না। কিন্তু সেখানকার ব্যয় নির্বাহের উপায় কী? নিজেই উপার্জন করতে হবে।

প্রবন্ধ লেখা, বক্তৃতা প্রদান ও ছাত্র পড়ান—তিন উপায়ে তিনি উপার্জন করতে লাগলেন। এই সব কাজের সঙ্গে চলল ব্রিটিশ মিউজিয়ামে নানা জ্ঞানের, বিশেষত ভারতের সভ্যতা সম্বন্ধে পড়াশুনা। এই সময়ে যে সব বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লিখলেন পরিশিষ্ট (ক)-তে তার তালিকা দেওয়া হল। তখন যাঁরা বিলাতে ভারতীয় সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার জন্য তৈরি হতেন তাঁদের কৃতকার্যতায় সাহায্য করার জন্য সেকালে ছোট ছোট শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ছিল। প্রমথনাথ এখানে অধ্যাপকতা আরম্ভ করলেন। এরই কোন ক্লাসে রবীন্দ্রনাথ কিছুদিন প্রমথনাথের ছাত্র ছিলেন।

ভারতীয়ের ও ভারতের উন্নতি বিধানের জন্য লণ্ডনে যে ইণ্ডিয়া সোসাইটি সৃষ্টি হয়েছিল তিনি তার সম্পাদক নির্বাচিত হলেন। ১৮৭৯ হতে এই সমিতির কাজে তিনি লিপ্ত হয়ে নানা উদ্যমে অংশ গ্রহণ করলেন। ভারতীয়ের সিভিল সার্ভিসে প্রবেশ করায় তখন যে বিঘ্ন উপস্থিত হয়েছিল তার বিরুদ্ধে আন্দোলনের জন্য বিখ্যাত ব্যারিষ্টার ও ভারতনেতা লালমোহন ঘোষ (ইনি ১৯০৩ সনে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের মান্দ্রাজ অধিবেশনে সভাপতি হয়েছিলেন) বিলাতে প্রেরিত হন। তখন নানা সভা সমিতিতে তাঁর বক্তৃতার জন্য প্রমথনাথ আয়োজন করেছিলেন। লালমোহনের এই বক্তৃতা কার্যকরী হয়েছিল। প্রমথনাথ নিজেও দেশের মঙ্গলের জন্য উদাহরণসহ ইংরাজ গভর্নমেণ্টের ঔদাসীন্য ও কুশাসনের প্রতিবাদে নানা সভায় বক্তৃতা করতেন। সম্ভবত তাঁর এই কার্যকলাপ ইংলণ্ডস্থ ভারত গভর্নমেণ্টের বড় বড় কর্মচারীদের পছন্দ হল না।

চাকরীর দরখাস্ত তাঁর করাই ছিল। যে সব বিষয়ে তাঁর জ্ঞান বেশী

ছিল—ভূতত্ত্ব, জীববিদ্যা ও উদ্ভিদবিদ্যা—শিক্ষাবিভাগে তার কোন বড় চাকরী তখন ছিল না। সুতরাং তিনি ভূতত্ত্ব বিভাগে (Geological Survey of India) উচ্চপদে নিযুক্ত হলেন (১৩ই মে ১৮৮০)। গভর্ণমেণ্টের এই চাকরী নিয়ে স্বদেশে ফিরে গেলেই ইংরেজের নিষ্কৃতি। প্রমথনাথ ওখানেই কাজে যোগ দিলেন এবং ৩০শে জুলাই দেশে ফিরে এলেন।

দেশে প্রত্যাগমন ও সামাজিক বাধা

দেশে ফিরেই প্রমথনাথ কার্যে যোগ দিলেন। সরকারী কর্মস্থলে ও শিক্ষিত সমাজে তিনি পি. এন. বোস (P. N. Bose) নামে আখ্যাত হলেন। কলকাতার ইংরাজী শিক্ষিত অপেক্ষাকৃত প্রগতিশীল সমাজ তাঁকে সাদরে গ্রহণ করল। কিন্তু তাঁর গ্রাম ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের অধিবাসীদের কাছে সমুদ্রযাত্রা প্রায় ধর্মত্যাগের সমান। তাঁদের বিশ্বাস, যারা বিলাত যান তারা নিষিদ্ধ ভোজন করেন ও অনাচারী হয়ে থাকেন। ও অঞ্চলের বর্ধিষ্ণুগণ প্রমথনাথের উচ্চকর্মপ্রাপ্তিতে গৌরবান্বিত ছিলেন। তাঁরা কেবল প্রায়শ্চিত্ত করলেই প্রমথনাথকে সমাজে নিতে রাজী হলেন।

কিন্তু প্রথমনাথ প্রায়শ্চিত্ত করতে সম্মত হলেন না। তাঁর পিতা সমাজের এই শাসন শিথিল করার চেষ্টা করলেন। কিন্তু কৃতকার্য হলেন না। সমাজের এই কঠিন শাসনে প্রমথনাথের চিত্ত ক্ষুব্ধ হল এবং নিজের গ্রামাঞ্চলের প্রতি তাঁর অভিমান হল।

নূতন যুগের কোন প্রভাব তখন পর্যন্ত গৈপুর অঞ্চলে প্রবেশ করেনি, এমন নয়। পার্শ্ববর্তী খাঁটুরা গ্রামের ক্ষেত্রনাথ দত্ত ব্রাহ্মধর্ম অবলম্বন করেছিলেন। দত্ত মহাশয় ধার্মিক ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর বাড়ীতে কেশবচন্দ্র এসেছিলেন শুনে, প্রমথনাথ বাল্যকালে একবার তাঁকে দেখতে যান। সেখানে যে সঙ্গীত, ধর্মালোচনা ও বক্তৃতা হয় তাতে বহু লোক যোগ দিয়েছিল। এই খাঁটুরা হতেই কুশদহ পত্রিকা নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হত। এই পত্রিকায় ধর্ম, সমাজ ও নীতির পরিপোষক তথ্য ও সংস্কারধর্মী আলোচনা থাকত। কালে কালে এই পত্রিকা কেশবচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত কলকাতার বিখ্যাত 'সুলভ সমাচার' নামক পত্রিকার সঙ্গে এক হয়ে যায়।

তবু ও-অঞ্চলের মানুষ তখনও এতখানি সংস্কারমুক্ত হননি যে, তাঁরা প্রমথনাথকে বিনা প্রায়শ্চিত্তে সমাজভুক্ত করে নিতে পারেন। সুতরাং প্রমথনাথ স্বগ্রামে গৃহীত হলেন না। তাঁর পক্ষে ব্রাহ্ম হয়ে যাওয়া অসম্ভব ছিল না। কিন্তু তিনি যে হিন্দুধর্ম ও সমাজ ত্যাগ করলেন না তার আরও প্রমাণ উপস্থিত করলেন তাঁর বিবাহের সময়।

বিবাহ করলেন বিলাত প্রত্যাগত বিখ্যাত সিভিলিয়ান রমেশচন্দ্র দত্তের প্রথমা কন্যা কমলাকে। সমুদ্রযাত্রা-হেতু হিন্দুসমাজের রক্ষণশীলদল তাঁকেও প্রথম দিকে খুব পাংক্তেয় গণ্য করতেন না। তবু সিভিলম্যারেজে প্রথমনাথ রাজী হলেন না। হিন্দুমতেই তাঁর বিবাহ হল। তাঁর গৈপুরের পারিবারিক পুরোহিতই বিবাহ দিলেন।

প্রথমনাথ রক্ষণশীল সমাজের কাছে পরাজয় মানলেন না। গৈপুরও তাঁকে দীর্ঘকাল গ্রহণ করেনি। প্রায় ৪০ বৎসর পর কুশদহ সমিতির চতুর্থ বার্ষিক সভায় সভাপতিরূপে তাঁকে আমন্ত্রণ করে সম্মানিত করা হয়। তখন হতে ও-অঞ্চলের নানা অনুষ্ঠান ও সৎকার্যে তাঁর প্রত্যক্ষ সংযোগ ছিল।

বিবাহ

কলকাতায় প্রায় ছয়মাস চাকরী করার পর কমলাদেবীর কাকা—তখন চুঁচুঁড়া কলেজের রসায়নের অধ্যাপক—অবিনাশচন্দ্রের আমন্ত্রণে একদিন প্রমথনাথ রমেশচন্দ্রের ২০ নম্বর বিডন স্ট্রীটের বাড়ীতে এলেন। বিলাতে পড়াশুনা করার সময় অবিনাশচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর বান্ধবতা হয়। সেই সূত্রেই এই আমন্ত্রণ।

এখানে প্রমথনাথের সঙ্গে কমলাদেবীর পরিচয় হল। এইভাবে মাস ছয়েক দেখাশুনার পর কমলাদেবীর নম্র স্বভাব, সঙ্গীতে দক্ষতা ও নানা সৎগুণে আকৃষ্ট হয়ে প্রমথনাথ স্বয়ং কমলাদেবীর অভিভাবকদের কাছে বিবাহের প্রস্তাব করলেন। কমলাদেবী সম্মত হলে বিবাহ স্থির হল। একটি হীরার আংটি উপহার দিয়ে প্রমথনাথ বিবাহ পাকা করলেন।

কিন্তু বিবাহ হল প্রায় এক বৎসর পর ১৮৮২ সনের ২৪শে জুলাই। তখন প্রমথনাথের বয়স সাতাশ এবং কমলার ষোল। রমেশচন্দ্রের বয়স ৩৪ বৎসর

শ্বশুর জামাতা বন্ধুর মত মিশতেন। বিবাহের পরেই রমেশচন্দ্র বালেশ্বরের জেলাকর্তা হয়ে সেখানে চলে গেলেন।

কমলা ছিলেন মিস পিগটের স্কুলের ছাত্রী। প্রথম দিকে তাঁর বোর্ডিং স্কুলেই থাকতেন। পরে বাড়ী হতে গিয়ে তার বৌবাজারের স্কুলে পড়ে আসতেন। এখানে ইংরাজ ও এদেশী বিলাত-ফেরৎ এবং তদ্‌ভাবাপন্নদের স্ত্রী ও কন্যারা পড়তেন। পিতা ও স্বামীর উন্নত জ্ঞান, সংস্কার-প্রাপ্ত দৃষ্টিভঙ্গী ও আচারব্যবহারের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে চলার জন্য আবশ্যকীয় সব রকম শিক্ষাই তাঁরা পেতেন। গান বাজনাও শেখা হত। যে এক বৎসর তাঁরা বাক্‌দত্ত হয়েছিলেন প্রমথনাথ কমলা দেবীর শিক্ষার আরও উন্নতি বিধানের জন্য উৎসাহ দিয়ে তাঁকে চিঠি লিখতেন। কেবল ইংরাজী নয়, রমেশচন্দ্রের মত অতবড় মনীষীর কন্যা তিনি—সংস্কৃতও শিখেছিলেন কিছু। প্রমথনাথ তা জেনে খুব খুসী।

এই বিবাহ প্রমথনাথের জীবনের চিন্তাধারার বিশেষ সহায়ক হয়েছিল। মিস্ পিগটের স্কুলে কমলা দেবীর সহপাঠিনী ও সখী ছিলেন ব্রহ্মানন্দের কন্যা সুনীতি দেবী (ইনি পরে কুচবিহারের রানী হয়েছিলেন)। এবং সেই সূত্রে তাঁর বোনেদের সঙ্গেও তাঁর মিত্রতা হয়েছিল—এই বোনদের মধ্যে সুরুচি দেবীও ছিলেন। তিনি পরে ময়ূরভঞ্জের রানী হয়েছিলেন। রেভাঃ কালীচরণ ব্যানার্জির মেয়েদের সঙ্গেও এখানে তাঁর বান্ধবতা হয়।

শিক্ষিত সজ্জনমাত্রেই রমেশচন্দ্রের বান্ধব ছিলেন। রামবাগানের প্রসিদ্ধ দত্ত পরিবারের উজ্জল জ্যোতিষ্করূপে তিনি একদিকে যেমন কলকাতার কায়স্থদের মধ্যে বিশিষ্ট ব্যক্তি হয়েছিলেন, তেমনি বিখ্যাত মনীষী ও (অত বড় সরকারী চাকুরিয়া হওয়া সত্ত্বেও) দেশপ্রেমিকরূপে তিনি ধীরে ধীরে এদেশের অধিকাংশ মানুষের মনে সম্মানের আসন অর্জন করেছিলেন। কমলা-প্রমথনাথের বিবাহ উপলক্ষে নিমন্ত্রিত হয়ে এসে এখানেই রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমবাবুর কাছে 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' কবিতার প্রশংসা ও মালা পেয়েছিলেন, কবির 'জীবনস্মৃতি'তে সে বিবরণ আছে।

বিলাতের জীবনের সঙ্গে পরিচিত হয়ে এসে প্রমথনাথ স্থির করেছিলেন যে, জ্ঞানের প্রচার, বিজ্ঞানের অনুশীলন, উন্নত কারিগরী শিক্ষার প্রসার ও শিল্পের সৃষ্টি—এই বিবিধ কর্মের দ্বারা ভারতের উন্নতি হবে। তাই এদেশে আসা অবধি সেই সব কার্যে তিনি নিজেকে নিযুক্ত করেছিলেন তাঁর সরকারী চাকরী

সত্ত্বেও। সুতরাং তাঁর সহধর্মিণী নির্বাচন ঠিকই হয়েছিল। পরবর্তী অধ্যায়-গুলিতে আমরা তার পরিচয় পাব।

তাঁদের ৯টি সন্তানের জন্ম হয়; চারটি পুত্র ও পাঁচটি কন্যা।—অশোক (১৮৮৩), আলোক (১৮৮৪), সুষমা (১৮৮৭), সুরমা (১৮৮৮), প্রতিমা (১৮৯০), পূর্ণিমা (১৮৯৩), অমরনাথ (১৮৯৫), উমা (১৮৯৭), মধু (১৯০০)। স্ব স্ব ক্ষেত্রে এঁরা সকলেই যশ অর্জন করেছেন। পরে সে বিবরণ প্রদত্ত হবে।

ভারতীয় ভূতত্ত্ব বিভাগের প্রারম্ভ

বাণিজ্য করতে এসে বিলাতের ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী পলাশী-যুদ্ধে জয়লাভ করে (১৭৫৭) বাংলাদেশের শাসকের আসনে বসলেন। কয়েক বৎসরের মধ্যেই তাঁরা কৌশল, উন্নত যুদ্ধাস্ত্র, যুদ্ধ-বিজ্ঞান ও সৈন্য-পরিচালনা দ্বারা প্রায় সমগ্র ভারতের শাসন কর্তৃত্ব পেলেন। তখন ইংরাজ জাতি তাঁদের এই নবলব্ধ রাজ্যের বিবিধরূপ ঐশ্বর্যের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার জন্য নানারূপ কর্মের সূচনা করলেন।

১৭৭৯ সনের পার্লামেণ্টের আইন অনুযায়ী রয়েল সোসাইটির সভ্য রেনেল কর্তৃক বঙ্গ ও বিহারের উৎকৃষ্ট মানচিত্র অঙ্কিত হল। তদবধি ভারতের নানা সম্পদ ও ইতিহাসের সন্ধান সুরু হল। রাজ্যশাসনের নানা বিভাগে নিযুক্ত হয়ে যে সব জ্ঞানবান ও কর্মী ইংরাজ এদেশে আসতেন তাঁরা বহু উৎকৃষ্ট কর্মের সূচনা করেছিলেন। তাঁদের সংগৃহীত জ্ঞান সঞ্চিত হয়ে ক্রমে মূল্যবান বৃহৎ পুস্তকের উপাদানের সৃষ্টি হল। এদিকে দেশীয় শিল্পগুলির অবস্থার সম্যক পরিচয় পেয়ে বণিকস্বার্থের প্রভাবে নানারূপ ব্যবস্থা অবলম্বনের ফলে ভারতীয় শিল্পগুলির দীপ নিভে এল। (Major B. D. Basu-র 'Ruin of Indian Trade and Industries' পুস্তক দ্রষ্টব্য)। তাঁরা মাঝে মাঝেই ভারতের শিক্ষাব্যবস্থার, রীতিপদ্ধতিরও সংস্কার সাধন করতে থাকলেন—উদ্দেশ্য, তাঁদের দেশশাসন ও বাণিজ্যের সহায়তা।

ভারতের জ্যামিতিক মানচিত্র তৈরীর জন্য একটি বিভাগ খোলা হয়। কর্ণেল ল্যাম্পটন তার সার্ভেদলের (জরিপ) কর্তা হন। এঁদের সঙ্গে থাকতেন ডাক্তার ও ভূতত্ত্ববিদ্ ডাঃ ভয়সে (১৮১৮)। তা হতেই ভারতে

খনিজের সন্ধানের প্রারম্ভ। ইংরাজ জাতির এই সব কাজ কেবল স্বার্থপরতা নয়, তাঁদের দূরদর্শিতা, জ্ঞানের ব্যবহার ও কর্মশক্তির পরিচায়ক বটে।

তারপর অনেক ইংরাজ এদেশে এসে অন্য কাজের ফাঁকে ফাঁকে খনিজের সন্ধান করতেন, মানচিত্রাদি সম্বলিত প্রবন্ধ লিখে পরস্পরের অবগতির জন্য এসিয়াটিক সোসাইটিতে পাঠ করতেন। কিন্তু তখনও গভর্নমেণ্ট এজন্য কোন বিভাগ খোলেননি। কয়লা ও খনিজের সন্ধানের জন্য ১৮৩৭ সনে প্রথম এক কমিটি নিযুক্ত হয়। তারই ক্রমবিকাশ হল ১৮৫১ সনে Geological Survey of India (ভারতবর্ষীয় ভূতত্ত্ব বিভাগ) এর প্রতিষ্ঠা দ্বারা। বিখ্যাত ভূতত্ত্ববিদ্ টমাস ওল্ডহ্যাম হলেন প্রথম সুপারিনণ্টেণ্ডেণ্ট।

উপরে যে সব উৎকৃষ্ট পুস্তকের উৎপত্তির কথা বলা হয়েছে তন্মধ্যে Watt (ওয়াট) এর Dictionary of the Economic Products of India, 1884-94 (ভারতের অর্থকরী পদার্থের অভিধান, ১৮৮৪-৯৪); Dymock, Warden ও Hooper (ডাইমক, ওয়ারডেন ও হুপার) রচিত A History of the Principal Drugs of Vegetable Origin met in India, 1890 (ভারতে-দেখা প্রধান প্রধান উদ্ভিজ্জ ঔষধের ইতিহাস, ১৮৯০) এবং Francis Day (ফ্রান্সিস ডে) প্রণীত Fishes of India 2 vol, London, 1876 (ভারতের মাছ, দুই খণ্ডে, লণ্ডন, ১৮৭৬) প্রভৃতি একবারে ঐতিহাসিক সামগ্রীর মর্যাদা অর্জন করেছে। Geological Survey of India বিভাগের পরবর্তীকালের কর্তা মিঃ হল্যাণ্ড খনিজ বিষয়ক অংশ দেখে দিয়েছিলেন বলে মিঃ ওয়াট তাঁর পুস্তকের পরবর্তী সংক্ষিপ্ত সংস্করণের ভূমিকায় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন।

ভূতত্ত্ব বিভাগের কাজ

খনিজের সন্ধান বড় সহজ কাজ নয়। খনিজ হল, স্বাভাবিক অবস্থায় মাটির উপর বা নীচে পাওয়া জিনিষ—যেমন তৈল, কয়লা, রত্ন, ও অনেক ধাতব বস্তুর আকর, যা হতে মানুষের অনেক প্রয়োজনীয় জিনিষ উৎপন্ন হয় বা যা নিষ্কাশিত করে সভ্য মানুষ ধাতব ও অন্য নানা ব্যবহার্য সামগ্রী অর্জন করে। এইসব আকর কখনও কখনও মাটির উপরেই দেখা যায়, কখনও বা মাটির

নীচে লোকলোচনের অন্তরালে থাকে। কখনও বা এত নীচে থাকে যে কেবল অতি উৎকৃষ্ট আধুনিক যন্ত্রের ব্যবহারের দ্বারা ভূপৃষ্ঠ হতেই তার আভাস পাওয়া যায়।

ভূস্তরস্থ খনিজের সন্ধান ইত্যাদির জন্য ভূবিদ্যা বা ভূতত্ত্বের উৎপত্তি। এই বিদ্যা পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানের একটি বিশিষ্ট শাখা। ভূবিদ্যার সাহায্যে যাঁরা খনিজের সন্ধান করেন তাঁদের কাজে বিশেষ ধৈর্য, যত্ন ও শ্রম আবশ্যক।

সহর হতে দূরে গ্রামে, গভীর অরণ্যে, কখন বা লোকের দূরধিগম্য স্থানে, পর্বত-শীর্ষে, হিমপ্রবাহের পার্শ্বে তাঁদের তাবুতে থেকে কাজ করতে হয়। পাশাপাশি, কোনাকুনি, কখনও বা দক্ষিণে ও পূর্বে অপ্রশস্ত কিন্তু গভীর এবং গভীরতর পরিখা কেটে আকরের পরিধি ও স্তর আবিষ্কার করতে হয়। [আজকাল এমন যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়েছে যে, তার সাহায্যে ভূগর্ভের বহু নিম্নস্তরে অবস্থিত তৈলের খনিরও আভাস পাওয়া যায়। সম্প্রতি জানা যাচ্ছে যে, ঐরূপ আভাস পেয়ে তা অনুসরণ করে নলকূপ বসিয়ে বোম্বাই সহরের নিকট ক্যাম্বে অঞ্চলের এক নিম্নভূমিতে ঠিক এক মাইল নীচে তৈলের বিপুল খনি আবিষ্কৃত হয়েছে। এত কাছে তৈল পাওয়া নাকি খুব ভাগ্যের কথা]। এইভাবে ভারতীয় ভূতত্ত্ব বিভাগের দ্বারা ক্রমে সমগ্র ভারতের মানচিত্রের উপর চিহ্ন করা হতে থাকে, কোথায় কোন্ স্তরে কতখানি কোন্ বস্তুর আকর আছে।

প্রমথনাথ কর্তৃক ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশে খনিজের আবিষ্কার
১৮৮০ হতে ১৮৯৩

ভারত গভর্নমেণ্টের ভূতত্ত্ববিভাগের উচ্চকর্মচারীর আসনে ভারতবাসীদের মধ্যে প্রমথনাথই প্রথম নিযুক্ত হলেন (১৮৮০)। তিনি এসে মেডলিকটকে বিভাগের কর্তারূপে দেখলেন। তাঁর নিজের পোষ্ট হল তৃতীয় সিঁড়ির সহকারী সুপারিনটেণ্ডেণ্টের। তিনি এত যত্ন করে তাঁর কাজ করতেন যে, সাত বৎসর পরেই তিনি দ্বিতীয় শ্রেণীতে উন্নীত হয়ে ডিপুটি সুপারিনটেণ্ডেণ্টের পদ পেলেন।

এই সাত বৎসর তাঁর কাজ ছিল দেশের নানা স্থানে ভ্রমণ করে খনিজের সন্ধান ও তৎ-সম্বন্ধে মানচিত্রাদি সম্বলিত রিপোর্ট প্রদান। শরৎকালের

প্রারম্ভেই (অক্টোবর) তিনি সদলে বেড়িয়ে যেতেন, ফিরে আসতেন বর্ষার প্রারম্ভে (এপ্রিলে)।

এইসব অভিযানে তাঁর গন্তব্য স্থান ছিল মধ্যপ্রদেশ। এবং সে সব অভিযানে তার যে সব আবিষ্কার হল তা বিবিধ প্রবন্ধ ও রিপোর্টে প্রকাশিত হল। পরিশিষ্ট (গ) তে তার বিবরণ প্রদত্ত হল। নর্মদানদীর নিম্নাংশের খনিজ সম্পদ, রায়পুর অঞ্চলের লিগনাইট (একরূপ কয়লা), রায়পুর জেলার পশ্চিমাংশের লৌহশিল্প, রাইপুর ও বালাঘাটের আগ্নেয়শীলা, জব্বলপুরের লৌহ ও ম্যাঙানিজ ঘটিত খনিজ তাঁর সন্ধানে ধরা পড়ল।

প্রমথনাথের (P. N. Bose) কাজ খুব মূল্যবান মনে হওয়ায় তিনি ১৮৮৯ সন পর্যন্ত মধ্যভারতেই প্রেরিত হতে থাকলেন। বাংলাদেশেও কিছু সন্ধান তিনি করলেন। বরাকর ও রাণীগঞ্জ অঞ্চলের আভের স্তর আবিষ্কৃত হল। এবং জব্বলপুরের ম্যাঙানিজ ও ম্যাঙানিজ ঘটিত লৌহের বিস্তৃত খনিজ পাওয়া গেল। এ সম্বন্ধে প্রমথনাথের মূল্যবান প্রবন্ধাবলী প্রকাশিত হল।

প্রমথনাথের পরবর্তী কাজ হল দার্জিলিং অঞ্চলে কয়লা আবিষ্কার। ১৮৯১ সন পর্যন্ত একাজ চলেছিল। সিকিমের খনিজ সম্পদের সন্ধান করা হল। সেখানে আবিষ্কৃত হল তামার আকর। দক্ষ ও কষ্টসহিষ্ণু কর্মচারী বলে প্রমথনাথ পরবৎসর ব্রহ্মদেশের নিম্নভাগের খনিজ সম্পদ সন্ধানের জন্য প্রেরিত হলেন। এই সময় নবনিযুক্ত কর্মচারী পার্বতীনাথ দত্ত সেখানে তাঁর সঙ্গে যুক্ত হলেন। এখানে কয়লার খোঁজ তাঁরা পেয়েছিলেন এবং প্রায় দুই বৎসর কাজ করে তাঁরা নানা আকরের সন্ধান পেয়ে চিত্র সম্বলিত রিপোর্ট প্রদান করলেন। এই সব আবিষ্কার-প্রবন্ধের তালিকা পরিশিষ্ট (গ) তে দেওয়া হল।

ভূতত্ত্ববিদ প্রমথনাথ ও তাঁর সরকারী চাকরী

১৮৯৩—১৯০৩

ফিরে এসে তিনি রেওয়া ও তার পূর্বস্থিত প্রায় ২০০০ বর্গমাইল ব্যাপী স্থানে খনিজের সন্ধান করলেন। ইতিমধ্যে তিনি অস্থায়ী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এর পদ পেয়েছিলেন (১৮ই জুলাই, ১৮৯৩)। তার দুই বৎসর আগে নিযুক্ত

গ্রিবাস বিভাগের ডিরেক্টর হলেন (২০শে জুলাই, ১৮৯৪)। প্রমথনাথ প্রায় দুই বৎসর অস্থায়ী সুপারিণ্টেণ্ডএণ্ট রইলেন, তাঁকে পাকা করা হলনা। এতদিন চাকরী করায় এই উচ্চকর্মের রীতি অনুযায়ী তাঁর দুই বৎসর ছুটি (ফার্লো) পাওনা হয়েছিল! ১৮৯৫ সনের ১৫ই মে তিনি ছুটি নিলেন। দুই বৎসর পর ফিরে এসে তিনি আবার দ্বিতীয় শ্রেণীর ডেপুটি সুপারিণ্টেণ্ডএণ্ট হলেন, কোন প্রমোশন তিনি পেলেন না।

উপরোক্ত ছুটির সময়টা তিনি তার Hindu Civilization under British rule নামক বিখ্যাত পুস্তক লিখতে ব্যাপৃত ছিলেন। এই প্রসঙ্গে একটি কথা এখানে বলা সঙ্গত যে, প্রমথনাথ নানা বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন এবং তার উন্নত ধীশক্তি গুণে স্বদেশীয়দের হিতকর নানা রচনায় এই দেশপ্রেমিক সব সময়ই নিযুক্ত থাকতেন। ভিন্ন ভিন্ন নিবন্ধে এই প্রসঙ্গের আলোচনা করা হবে। এখন কেবল এই পুস্তকের পরিশিষ্ট (খ), (ঘ) ও (ঙ) এর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

ছুটি হতে ফিরে এসে তিনি রেওয়ার উত্তর পশ্চিমে মান্দালা জেলায় সন্ধান কার্যে ব্যাপৃত হলেন। তারপর বস্তার নামক দেশীয় রাজ্যের খনিজ সন্ধান করা হল। ১৯০০ সন পর্যন্ত এই কাজ চলেছিল। তারপর আসামের খাসিয়া ও জইন্তিয়া পাহাড়েও অনুসন্ধান হল। জোয়াইএর দুই তিন মাইল দূরেই কয়লার স্তর পাওয়া গেল। এবং খাসিয়ার উপত্যকায় একস্থানে কিছু তৈল উদগীর্ণ হতে দেখা গেল। শিলিংএর কাছে বরপানীতে কিছু কয়লার স্তর দেখতে পেয়ে তার পরিমাণ সন্ধান করে করে উমরিলেং নদীতীরে সেই স্তরের প্রান্ত আবিষ্কৃত হল।

অতঃপর প্রমথনাথ নিজ বিভাগের কাজ ছাড়াও কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজের ভূতত্ত্ব বিভাগের ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক নিযুক্ত হলেন (১৯০১)। তখন একজন করে বড় কর্মচারীকে এরূপ কাজের দায়িত্ব দেওয়া হত। বস্তুত এই বিভাগের সাহায্যেই ঐ কলেজের ভূবিদ্যা শিক্ষার প্রবর্তন হয় (১৮৯২) এবং প্রথমত এই বিভাগের টমাস হেনরী হল্যাণ্ডই এই কলেজে এই বিদ্যা শিক্ষার সুব্যবস্থা করেন। ১৯০৩ সন পর্যন্ত এই অধ্যাপনার কাজ অত্যন্ত যত্ন করে প্রমথনাথ করলেন। তাঁর চিত্তাকর্ষক বক্তৃতায় এবং ভূবিদ্যার প্রয়োজনীয়তা প্রদর্শনে বহু মেধাবী ছাত্র এই বিদ্যার দিকে আকৃষ্ট হল। কৃতজ্ঞতাস্বরূপ এই বিভাগে পরে তাঁর একটি চিত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

১৯০৩ সনেই তিনি গভর্ণমেণ্টের কর্মত্যাগ করলেন। তখন তাঁর বয়স ৪৯ বৎসর। প্রমথনাথের কন্যা সুষমাদেবী জানিয়েছেন যে উপরি লিখিত হেনরী হল্যাণ্ড গভর্ণমেণ্টের ভূতত্ত্ব বিভাগে পরে নিযুক্ত হয়েও তার উপরে প্রমোশন পাওয়াতে তিনি ক্ষুব্ধ হয়ে পদত্যাগ পত্র পাঠিয়ে দেন। হল্যাণ্ডের সঙ্গে তাঁর প্রীতি ছিল। কিন্তু এই অবিচার তিনি সইতে পারলেন না। পদত্যাগ করায় তিনি পুরা পেন্সন পেলেন না। পেলেন তখনকার পুরা বেতনের একের তিন অংশ মাত্র অর্থাৎ ৪১৩ টাকা মাত্র। কিন্তু তাঁর কর্মশক্তিতে বিশ্বাস ছিল। তখনও তাঁর সব ছেলেমেয়েদের পড়া ও বিয়ে হয়নি। তা ছাড়া তাঁর ভাইদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার ব্যয় তিনি বহন করতেন। তবু তিনি বিচলিত হলেন না।

সরকারী চাকরীতে কমলাদেবীর সহযোগ

সারাদিনের বাইরের কাজের পর ঘরে ফিরে পারিবারিক আবেষ্টনের স্নিগ্ধতায় মানুষের দেহমন পুনর্জীবিত হয়। যাঁকে বছরে ছয়মাস ঘর ছেড়ে দূরদেশে মাঠে, জঙ্গলে, পাহাড়ে, পর্বতে শিবিরে শিবিরে যাপন করতে হয় তার সে সুযোগ কোথায়? কলকাতায় এসে অবধি খনিজের সন্ধানকারী দল নিয়ে প্রমথনাথ প্রতি বৎসর এমনি করেই ছয়মাস প্রবাস জীবন যাপন করতেন। কিন্তু বিবাহের পর কমলাদেবী আর তাঁকে একলা যেতে দিলেন না। নিজেও স্বামীর সাথী হওয়া স্থির করলেন। তাঁর দৃঢ়তা ও আগ্রহ দেখে তাঁর পিতৃকুল ও শ্বশুরকুল, কেউই বাধা দিলেন না। বিবাহের তিনমাস পরেই তাঁরা রায়পুর চলে গেলেন। সেখান হতে ছয়মাসের জন্য তাঁরা চলে গেলেন এমনি সব স্থানে যেখানে রেল চলে না। ঘোড়া ও উট সম্বল। আগে কোনদিন ঘোড়ায় চড়েননি। স্বামীর ঘোড়ার সঙ্গে তাঁর ঘোড়াও চলল। তাঁর ঘোড়ার জিনে পাশ থেকে বসতে হত। উটের পীঠে চলত তৈজসপত্র, ভৃত্য ও দাসী। ১৫ মাইল দূরে দূরে চার পাঁচ দিন পর পর তাবু পড়ত। ইতিমধ্যে খনিজের সন্ধান, রিপোর্টের জন্য মন্তব্য লেখা ও মানচিত্রের ছক্ আঁকা হত।

সন্ধ্যায় স্বামী পল্লীবাসীদের নিয়ে গল্প করতেন। তাদের দেশের কথা, চাষের প্রকৃতি, রীতিনীতির বৈশিষ্ট্য, ধর্মের অনুশাসন, উৎসবের পদ্ধতি—সব

পরম স্নেহে তিনি জেনে নিতেন। রোগে ঔষধ দিতেন, শিক্ষার সম্ভাবনা বুঝবার চেষ্টা করতেন, কখনও বা তাদের স্থানীয় বাদ্যসহকারে সঙ্গীত শুনে উদ্দীপিত হতেন।

কমলাদেবী স্বামীর এই সান্ধ্যসভায় যোগ দিতেন, প্রমথনাথের যেখানে ভারতীয়ের প্রতি স্নেহের উৎস আছে সেখানে তাঁর নারীহৃদয়ের মমতা উচ্ছ্বসিত হত। সারাদিন যিনি ছিলেন গৃহিনী, স্বামীর কর্মক্লান্ত সন্ধ্যায় তিনি হতেন সঙ্গিনী। দূরদেশে এইরূপ অপেক্ষাকৃত কঠোর জীবন যাপনের দ্বারা তাঁর মন ও শরীর দৃঢ় হল। কখনও বা প্রস্রবণ, পুরাকালের দুর্গ ও প্রাসাদ দেখা হয়ে যেত। এইসব নির্বান্ধব প্রবাসযাত্রায় স্বামীর সাহচর্যেই তাঁর চিত্ত পূর্ণ থাকত। তাই প্রতিবার তিনি প্রমথনাথের সঙ্গে যেতেন। ধীরে ধীরে তাঁর সন্তান হতে থাকল। তাদের সঙ্গে নিয়েই তিনি যেতেন—মধ্যভারতের নানা জেলায়, আসাম, দার্জিলিং, সিকিম, ব্রহ্মদেশ।

কিন্তু ব্রহ্মদেশে যাওয়ার সময় সব সন্তানদের তিনি নিতে পারলেন না। প্রথম তিনজনকে নিলেন, ছোট দুইজনকে তাদের দিদিমায়ের কাছে রেখে গেলেন। ফিরে এলেন ১৮৯৩ সনের এপ্রিল মাসে। এইভাবে এগার বৎসর তিনি স্বামীর প্রবাসজীবনে তাঁর সাথী হয়েছিলেন। —তারপর আর পারেননি। তখন ছেলেমেয়েরা বড় হচ্ছিল। তাদের পড়াশুনার ব্যবস্থা করতে হয়। তাঁর নিজের শরীরও আর তত সুস্থ ছিল না।

প্রমথনাথের এইসব ভ্রমণ তাঁর চিত্তে নানা ছবি নিয়ে আসত। সেইসব অভিজ্ঞতা তাঁকে চিন্তাশীল, সর্বমানুষের প্রতি সহানুভূতিশীল করেছিল। তাঁর জীবন অনুসরণ করলে আমাদের বক্তব্য আরও পরিস্ফুট হবে।

তাঁকে একবার তিব্বতের সীমানায় যেতে হয়েছিল। কমলাদেবীকে অতদূরে নিয়ে যেতে পারেননি। তাঁর অবগতির জন্য সেখানকার দৃশ্যটি 'হিমালয়ের একটি নীহারবাহুর পাশে' শীর্ষক একটি সুন্দর প্রবন্ধে তিনি ধরেছিলেন। আমাদের বক্তব্য অনুসরণ করে সেই প্রবন্ধ হতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করছি।

"অসংখ্য জীবের অশেষ হিত করিয়া পরে তুমি অনন্ত সাগরে মিশিবে। তখন দৃশ্যত তোমার জীবনের শেষ হইল বটে, নদীর নদীত্ব গেল বটে কিন্তু বাস্তবিক তোমার মৃত্যু হইল না। মহাসমুদ্রে বিলীত হইলে মাত্র। মহাসমুদ্র তোমার জন্মদাতা। তিনি আপনার শরীর হইতে জলীয় বাষ্প

হিমালয়ে প্রেরণ করিয়াছেন। ঐ জলীয় বাষ্প উচ্চশৃঙ্গে তুষাররূপে সংহত হইয়াছে। ঐ বরফ হইতে তোমার জন্ম। তোমার জীবনের শেষ হইলে জন্মদাতার ক্রোড়ে লুকাইলে।

নদি, তোমার জীবন, আদর্শ জীবন। মানব জীবনের সহিত অনেকটা সৌসাদৃশ্য আছে। কিন্তু তোমার জীবনের আদি হইতে অন্ত পর্যন্ত যেরূপ দেখিতে পাই মানব জীবনের আদি অন্ত সেরূপ দেখিতে পাই না। মানব জীবনেরও কি বাস্তবিক ক্ষয় হয় না? তোমার মত কোন অনন্ত সাগরে মিলিয়া যায়? ক্ষুদ্র মানবাত্মা অনন্তাত্মায় বিলীন হয়? তোমার জীবনের আরম্ভ হইতে শেষ পর্যন্ত যেরূপ আমরা দেখিতে পাই, সেইরূপ মানুষ অপেক্ষা উচ্চ জীব কি মানব জীবনের আদি অন্ত দেখিতেছে?"

এইটি লেখার সময় প্রমথনাথের বয়স ছিল ৩৪ বৎসর মাত্র।

সরকারী চাকরী ত্যাগ

পূর্বে এক অধ্যায়ে প্রমথনাথের চাকরী ত্যাগের বিবরণ সংক্ষেপে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু ঐ ছবিটি আরও স্পষ্টতর করা দরকার।

উচ্চশিক্ষিত যুবকরূপে তিনি রমেশচন্দ্র দত্তের গৃহে আমন্ত্রিত হয়ে সেখানে তাঁর সঙ্গে পরিচিত হন। পরে রমেশ দত্তের কন্যার সঙ্গে প্রমথনাথের বিবাহ হলে এই বন্ধন আরও দৃঢ়তর হয়। তখন এই দুই পরিবারের অভিভাবক ও সন্তানদের শিক্ষাদীক্ষা ও মনের বৃত্তি একই পথে চলতে থাকে। রমেশ দত্তের দেশপ্রেম, ইতিহাসের চর্চা ও জগতের জ্ঞানের ক্ষেত্রে ভারতের জন্য সম্মান অর্জনের চেষ্টা আজও তাঁকে এদেশে স্মরণীয় করে রেখেছে। প্রমথনাথের চিত্তেও পূর্বাবধি এই মনোভাব বাসা বেঁধেছিল। তাই বিলাতে থাকার সময়ই ছাত্রাবস্থায়ই (১৮৭৭) Indo-Aryan Civilization (ভারতের আর্য সভ্যতা) বিষয়ে প্রবন্ধ লিখে তিনি পুরস্কার পেয়েছিলেন। এদেশে আসার পর তাঁর লিখিত নানা প্রবন্ধে স্বদেশের মঙ্গল চেষ্টা ক্রমে নানা আকার পেতে থাকে। পরবর্তী কালে রমেশ দত্তের সাহচর্য এই মনোভাবের আরও সহায়ক হয়েছিল।

সেকালের এইসব বড় চাকুরেদের রীতি অনুযায়ী ১৮৮৫ সনের ১৫ই মার্চ

হতে রমেশচন্দ্র দুই বৎসরের ফার্লো (সবেতন ছুটি) তে যান। ছুটি হতে ফিরে আসার দুই বৎসর পর তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ A History of Civilization in Ancient India based on Sanskrit Literature (১৮৮৯-৯০; সংশোধিত সংস্করণ, ১৮৯৩ সন)—প্রাচীন ভারতের সভ্যতার ইতিহাস—সংস্কৃতে লিখিত বিবরণ হতে—পুস্তকখানি প্রকাশিত হয়।

এই রীতি অনুযায়ী ১৮৯৫ সনের মে হতে প্রমথনাথ ও দুই বৎসর ফার্লো ভোগ করেন। ১৮৯৪-৯৬ প্রায় তিন বৎসরের সাধনায় A History of Hindu Civilization during British rule, 3 vols.—ব্রিটিশ শাসনের আমলের হিন্দুসভ্যতার ইতিহাস, তিন খণ্ডে, লিখিত হল। [পরিশিষ্ট (ঘ) দ্রষ্টব্য]।

এই পুস্তক দুইখানির বিষয়, রচনার কাল ও ক্রম বিচারে রমেশচন্দ্র ও প্রমথনাথের চিন্তা ও কর্মের একটা ধারা পাওয়া যাচ্ছে।

সিভিলিয়ান রমেশচন্দ্র দত্ত ১৮৭১ সনে প্রথম রাজকার্যে নিযুক্ত হন। ক্রমোন্নতিদ্বারা ১৮৯৪ সনে তিনি বর্ধমান বিভাগে অস্থায়ীভাবে কমিশনার নিযুক্ত হন। অমনি ইংলিশম্যান কাগজে মন্তব্য প্রকাশিত হয় যে, দেশী কমিশনারের নীচে কাজ করা ইউরোপীয় সিভিলিয়নের পক্ষে কত কঠিন ছোটলাট ইলিয়ট সাহেব তা বিচার করুন। এইরূপ বিরূপতা আরও নানারূপে প্রকাশ হয়ে পড়ে। পরবৎসর রমেশচন্দ্র আবার জেলামেজিষ্ট্রেট হন এবং সাত মাস পরে আবার তাঁকে কমিশনার করা হয় উড়িষ্যায়। কিন্তু এবারেও অস্থায়ী। এই ভাবে দুই বৎসর চলেছিল। ১৮৯৭ সনে তিনি দশ মাসের ছুটি নিয়ে বিলাত চলে যান। তারপর আর কাজে যোগ দেননি। তখন তাঁর বয়স প্রায় ৪৯। এরপর দেশ-সেবা প্রভৃতি নানাকর্মে ব্যাপৃত ছিলেন। ১৯০৪ সনে তিনি বরোদা রাজ্যের রাজস্ব-সচিব হয়ে সেখানে চলে যান।

১৮৯৩ সনে অগ্রজকে লিখিত রমেশচন্দ্রের পত্র হতে সরকারী চাকরী সম্বন্ধে তাঁর মনোভাব জানা যাচ্ছে—"আমার নীচের লোক সচিব হয়েছে, বোর্ডের প্রধান সচিব হয়েছে, পুলিসের প্রধান কর্তা হয়েছে, এমনি সব বেশী বেতনওয়ালা চাকরী পেয়েছে। আমি অভিযোগ করছি না, কেবল অবস্থা বর্ণনা করছি। গভর্ণমেণ্ট যদি সত্যই আমার উপর যথেষ্ট আস্থা স্থাপন না করেন তবে আমি আমার কর্মক্ষমতা স্বদেশের মঙ্গলের জন্য নিয়োগ করব। (কিয়দংশ তর্জমাকৃত)।

প্রমথনাথের কর্মত্যাগের হেতুও যে প্রায় একইরূপ, পূর্বে তা উল্লেখিত হয়েছে। এই কর্মত্যাগের সময় প্রমথনাথের বয়সও ছিল প্রায় ৪৯। প্রমথনাথ সঙ্গে সঙ্গেই (১৯০৩, নভেম্বর) ময়ূরভঞ্জের রাজসরকারে ভূতত্ত্ব বিভাগের কর্ত্তারূপে নিযুক্ত হন। সেখানে তাঁর যে কাজ চিরস্মরণীয় হয়ে আছে তা পৃথক অধ্যায়ে আলোচিত হবে।

বিজ্ঞান ও শিল্পের প্রসার

প্রমথনাথ দেশে ফিরে এসেই ধীরে ধীরে এদেশের বিদ্বতমণ্ডলীগুলির সংস্পর্শে আসেন। সকলেই তাঁর ধীশক্তি, চিন্তার গভীরতা ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি দেখে আকৃষ্ট হন। তাই যখন এসিয়াটিক সোসাইটির শতবার্ষিকী উৎসব আসন্ন হল (১৮৮৩) তখন এই মাত্র ২৮ বৎসর বয়স্ক যুবকের উপর প্রবীণগণ একটি গুরুতর কার্যভার অর্পণ করলেন। উৎসব উপলক্ষে তিনখণ্ডে একটি বিবরণী পুস্তক ছাপান স্থির হয়। গত একশত বৎসর ধরে সোসাইটির পত্রিকায় যত প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে তার বিবরণ শ্রেণীবিভাগ করে তৈরি করা অতিশয় কঠিন কাজ। প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ লেখার ভার পেলেন বিখ্যাত ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও ডাক্তার হরন্‌লী সাহেব এবং তৃতীয়ভাগটি প্রমথনাথ। বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগে এই যুবকের জ্ঞান ও দক্ষতা ঐ প্রায় ২০০ শত পৃষ্ঠা ব্যাপী পুস্তকে আজো দীপ্যমান হয়ে আছে। পরবর্তীকালে (১৯৩৫) এখানে তাঁর নামে একটি পুরস্কারের ব্যবস্থা হয়েছে।

জাতির জীবনে নূতন শিক্ষাদীক্ষাও শিক্ষাপ্রচেষ্টার জন্য চেতনা সঞ্চারের উদ্দেশ্যে তিনি দেশে এসেই লিখতে ও বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করেন। পরিশিষ্ট (খ) ও (ঘ)-তে এইসব প্রবন্ধাদির নামের তালিকা আছে। তা হতেই তাঁর বক্তব্যের বিষয়ের ধারণা হবে।

আধুনিক বৈজ্ঞানিক কারিকুরী শিক্ষা ও শিল্পপ্রচেষ্টার প্রয়োজনীয়তা এই সময়ে আরো বহু নেতৃস্থানীয়গণ উপলব্ধি করেছিলেন। সুতরাং প্রমথনাথ এই আন্দোলনে একাকী ছিলেন না। কিন্তু তাঁদের মধ্যে অনেকেই বৈজ্ঞানিক ছিলেন না এবং আধুনিক বৈজ্ঞানিক বিদ্যায় যে কয়জন দীক্ষিত ছিলেন সম্ভবত তিনি তাঁদের সকলের পুরোভাগে ছিলেন। তাই কি পড়ান

হবে ও কি উপায়ে পড়ান হবে, তিনি তাঁর বিস্তৃত বিবরণ সম্বলিত পুস্তিকা ঘন ঘন প্রচার করতেন।

এই আন্দোলনে চারদিকে একটা উৎসাহের সঞ্চার হয়। ১৮৮৪ সনে তিনি নিজেই কলকাতায় একটা সাবানের কারখানা খুললেন। ১৮৯১ সনে কলকাতায় প্রথম শিল্প সন্মিলনী হল। প্রমথনাথ সভাপতি নির্বাচিত হলেন। ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যার প্রচার, ভারতে শিল্পের তালিকা রচনা ও নূতন শিল্পের প্রচেষ্টা—এই তিন প্রতিজ্ঞা নিয়ে সমিতির কাজ আরম্ভ হল। বার্ষিক শিল্পপ্রদর্শনী সুরু হল এবং সাত আটটি যৌথ কোম্পানী প্রভৃতি অচিরে দেখা দিল। ক্রমে এই শিল্প প্রদর্শনী কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনের অঙ্গ হল (১৯০১)। আজও সেই ব্যবস্থাই চলছে।

আসানসোলের একটি কয়লার খনিতে ১৮৯৬ সনে প্রমথনাথের স্বল্প সময়ও তিনি নিয়োগ করলেন। নিজের সরকারী চাকরী—অধিকাংশ সময় মফঃস্বলে থাকতে হয়। তাই দেখাশুনার সুবিধা হবে বলে ওখানেই একটি বাড়ী কিনে সেখানেই পরিবার রাখলেন। তাঁর সাবানের কারখানা ফলপ্রসূ হয় নি। কিন্তু ঐ খনির স্বত্ব ও বাড়ী ছেড়ে দিয়ে তার টাকা দিয়েই রাঁচীর প্রায় বিশ বিঘা জমি ও তার উপর প্রাসাদোপম বাড়ী তৈরি করেন। এই জমির কৃষি ও বাড়ী তাঁর পরবর্তী ২৬ বৎসরের ধ্যানী জীবনের পরিপোষক হয়েছিল। সে বিবরণ পৃথক অধ্যায়ে প্রদত্ত হবে।

শিল্পসন্মিলনীর কলকাতার দ্বিতীয় অধিবেশন হয় ১৯০৬ সনে। এই অধিবেশন জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে যোগ রেখে সম্পন্ন হয়েছিল এবং এই কাজে প্রমথনাথের নেতৃত্ব এতখানি স্বীকৃত হত যে, তিনি সমিতির অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। এই সমিতির কাজ আজও নানা আকারে এদেশে চলছে। দেশ স্বাধীন হওয়াতে আগেকার দিনের বিঘ্নগুলি অনেক কমে গেছে।

স্বদেশী প্রমথনাথ

দেশীয় শিল্প স্থাপনের জন্য সারা দেশে যে আন্দোলন ক্রমশ ছড়িয়ে পড়েছিল তার মূলে ছিল স্বদেশপ্রেম। দেশের শিল্পের প্রসার সম্ভব হয় যদি

দেশবাসীরা স্বদেশী সামগ্রী ব্যবহার করার জন্য পণ গ্রহণ করেন। এই পণ সমস্ত মানুষের মনে সঞ্চারিত করার জন্যও আন্দোলন উপস্থিত হয় শিল্পস্থাপনের চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে। আন্দোলনকে বলা হত স্বদেশী আন্দোলন। এই আন্দোলনের ফলে বঙ্গদেশে নানা শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতে লাগল।

দেশের তৈরী জিনিষ যাতে একসঙ্গে পাওয়া যায় তাই ব্যারিষ্টার জেঃ চৌধুরী বৌবাজারে খুললেন The Indian Stores এবং সরলাদেবী খুললেন 'লক্ষ্মী ভাণ্ডার'। একই উদ্দেশ্যে United Bengal Stores, United Bengal Co. খোলা হল।

প্রমথনাথ এসব দেখে খুব আনন্দ প্রকাশ করলেন, কিন্তু মূলধন, শিল্পশিক্ষা ও গভর্ণমেণ্টের সহায়তার আবশ্যকতা দেখিয়ে আন্দোলন উপস্থিত করলেন। (১৯০৩) শিল্পশিক্ষার জন্য গভর্ণমেণ্ট তখন সাহায্য দিতে অগ্রসর হলেন। বার্ষিক বৃত্তি দিয়ে গভর্ণমেণ্ট বিদেশে ছাত্র পাঠাতে লাগলেন। এইভাবে অনেক ছাত্রের বিদেশে শিল্পশিক্ষার সুযোগ হল। এদেশের নেতারা এখানেই নিরস্ত হলেন না। যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতির চেষ্টায় Association for the Advancement of Scientific and Industrial Education (বিজ্ঞান ও শিল্পশিক্ষা সমিতি) স্থাপিত হল। এই সমিতির অর্থে ১৯০৪ সনে ২৭ জন ও ১৯০৫ সনে ৪৪ জন ছাত্র বিদেশে প্রেরিত হল।

হিন্দু মুসলমানের সম্মিলিত এইসব আন্দোলনের গতি লর্ড কার্জন পছন্দ করেন নি। তিনি বঙ্গভঙ্গ করে এদেশের মধ্যে ভেদ আনতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ১৯০৫ সনে বঙ্গভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে স্বদেশী আন্দোলন বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। সরকারী চাকরীর আমলেই প্রমথনাথ এসব দেশহিতকর কাজে অগ্রসর ছিলেন, এখন তিনি এই আন্দোলনে ঝাপিয়ে পড়লেন।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের আদি

বঙ্গভঙ্গ কেবল স্বদেশী আন্দোলনকে তীব্রতর করেনি ; সঙ্গে সঙ্গে এসেছিল বিদেশী পণ্য বর্জনের পণ। এই পণে উদ্বোধিত হয়ে অনেক ছাত্র বিদেশী স্কুল কলেজও ছেড়ে দিয়েছিল, বিলিতী কাপড় ইত্যাদি আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া হত এবং যাঁরা বিদেশী বস্তু ব্যবহার করতেন তাঁদের দেশের শত্রুজ্ঞান করা হত।

এই প্রবল আন্দোলনের সময় নেতারা ১৯০৬ সনের ১লা জুন তুইটি সমিতি রেজেষ্ট্রী করে নিলেন। জাতীয় শিল্প পরিষদ (The National Council of Education) ও বঙ্গীয় কারিকুরী শিল্পপ্রসার সমিতি (The Society for the Advacement of Technical Education in Bengal)। প্রমথনাথের এতদিনের আন্দোলনের ফল এমনি করে ফলল। কারিকুরী শিল্পের জন্য কলেজ খোলার ভার তাঁর উপরেই দেওয়া হল। প্রমথনাথ অবৈতনিক অধ্যক্ষ নিযুক্ত হলেন।

"এই শতাব্দীর প্রারম্ভে স্বদেশী আন্দোলনের সময় স্বর্গত তারকনাথ পালিত আমার সঙ্গে পরামর্শ করেন যে কেমন করে এই আন্দোলনটিকে স্বদেশের মঙ্গলার্থ নিয়োগ করা যায়। কারিকুরী শিক্ষার উদ্দেশ্যেই বিদ্যালয় খোলার জন্যই আমি পরামর্শ দিলাম। তিনি খুব উৎসাহিত হলেন এবং আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু ডাঃ নীলরতন সরকারও বিশেষ আগ্রহ দেখালেন। ঘন ঘন আমাদের সভা হতে লাগল—অধিকাংশই ডাঃ সরকারের বাড়ীতে—কেমন করে কি পড়ান হবে তার বিস্তৃত আলোচনা। এইসব সভায় শ্রীযুক্ত পালিত ও সরকার ছাড়াও দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী, ডাঃ প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য, সত্যানন্দ বস্থ ও ভূপেন্দ্রনাথ বস্থ উপস্থিত থাকতেন। এখন যেখানে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজ স্থাপিত আছে ঐ স্থানেই বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনষ্টিটিউট প্রথম খোলা হয়। আমি নিযুক্ত হই অবৈতনিক অধ্যক্ষ ও ডাক্তার সরকার অবৈতনিক সম্পাদক।"

স্থানটির মালিক ছিলেন তারকনাথ পালিত। জগদীশচন্দ্র বস্থ, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, ব্রজেন্দ্র শীল, পি মুখার্জি ও চন্দ্রভূষণ ভাহুড়ী ছিলেন পরামর্শদাতা সমিতির সভ্য। প্রধান প্রধান দাতাদের মধ্যে ছিলেন কুচবিহারের মহারাজা, মহারাজা মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, ময়মনসিংহের মহারাজা, ডাঃ রাসবিহারী ঘোষ, দীঘাপাতিয়ার রাজা, তারকনাথ পালিত, লোকেন পালিত, কুমার মন্মথনাথ মিত্র, কুমার নরেন্দ্রনাথ মিত্র, গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মহারাজা ঠাকুর, সত্যেন্দ্রপ্রসাদ সিংহ, ব্যোমকেশ চক্রবর্তী, রাজেন্দ্রনাথ মুখার্জি, অনাথবন্ধু গুহ, দীপনারায়ণ সিংহ, শৈলেন্দ্রনাথ মিত্র, তিলকধারী লাল, জ্যোতিশ্চন্দ্র মিত্র। বিদ্যালয়ের কাজ আরম্ভ হয় ২৫শে জুলাই, ১৯০৬ হতে।

প্রমথনাথের যত্নে দ্রুত এই বিদ্যালয়ের উন্নতি হল। কিন্তু তিনি তখন ময়ূরভঞ্জের রাজার ভূতত্ত্ববিদ নিযুক্ত হয়েছেন। কলকাতা হতে অনুপস্থিত

থাকতে হত। তাই তিনি ১৯০৮ সনের শেষভাগে অধ্যক্ষের পদ ত্যাগ করলেন। বিশেষত সে সময় অতি যোগ্য পরিচালক মণ্ডলীর হস্তে কার্যভার ন্যস্ত ছিল। তাই তাঁর পদত্যাগে তাঁর অত প্রিয় প্রতিষ্ঠানের কোন অনিষ্টের আশঙ্কা ছিল না। রাসবিহারী ঘোষ ছিলেন সভাপতি। ডাঃ নীলরতন সরকার, সত্যানন্দ বসু ও রমণীমোহন চ্যাটার্জি ছিলেন সম্পাদক। তারকনাথ পালিত, রাজেন্দ্রনাথ মুখার্জি, প্রথমনাথ বসু, দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী, প্রাণকৃষ্ণ আচার্য, বনওয়ারীলাল চৌধুরী, মৌলবী সৈয়দ সামসুলহুদা প্রভৃতি ছিলেন সভ্য। গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কুমার মন্মথনাথ মিত্র ছিলেন কোষাধ্যক্ষ।

কিছুদিনের মধ্যে জাতীয় শিক্ষাপরিষদ ও বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনষ্টিটিউটের পরিচালক মণ্ডলী সম্মিলিত হয়ে জাতীয় শিক্ষাপরিষদ হয় (১৯১০)। তখন প্রমথনাথ এই সম্মিলিত বিস্তৃত প্রতিষ্ঠানের রেকটর (প্রধান আচার্য) নিযুক্ত হন। প্রতিষ্ঠানটি ৯২ নম্বর আপার সার্কুলার রোডেই ১৯১২ সন পর্যন্ত ছিল, তখন পর্যন্ত তারকনাথ পালিত মাসিক দুই হাজার টাকা করে এই বিদ্যালয়কে মাসোয়ারা দিতেন। এর পর এসব তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে দিয়ে দেন। তখন বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনষ্টিটিউট মানিকতলায় পঞ্চবটী ভিলাতে চলে যায়। তখন প্রতিষ্ঠানের ৯ লক্ষ টাকার ন্যস্ত সম্পত্তি হয়েছে এবং বার্ষিক আয় তখন ৫৫০০০ টাকা। অল্পদিনের মধ্যেই রাসবিহারী ঘোষের দান এল ১৬ লক্ষ টাকার উপর। তখন যাদবপুরে অতি বিস্তৃত ভূমির উপর এই প্রতিষ্ঠান উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু ইতিমধ্যে অনাবশ্যক বোধে সাহিত্য শাখা উঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এইসব ক্রমপরিণতিতে প্রমথনাথের কৃতিত্ব সামান্য ছিল না।

১৯২০ সন পর্যন্ত রেক্টরের এই পদে তিনি ছিলেন এবং পরে পদত্যাগ করেন। কিন্তু পরিচালক সমিতি তাঁর মূল্যবান উপদেশ পাওয়ার আশায় তাঁকে পরিদর্শক নির্বাচন করলেন। এবং ১৯৩২ সন হতে আবার তাঁকে কাউন্সিলের (প্রধান পরিচালক মণ্ডলী) সভ্য নির্বাচন করা হল।

ক্রমে বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনষ্টিটিউট আরও বড় হয়ে ওঠে। তখন ১৯২৯ সনের মে মাসে প্রতিষ্ঠানের নূতন নাম হয় College of Engineering and Technology, Jadavpur. এখানকার ছাত্রগণ ভারতের সর্বত্র যোগ্যকার্যে নিয়োজিত হয়ে দিন দিন প্রতিষ্ঠানের সুনাম ছড়িয়ে দিয়েছেন। বহু শিক্ষক ও

দাতা এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানটিকে সন্তানের মত এতদিন পরম স্নেহে পালন করেছেন। তার ফলে বর্তমান স্বাধীন গভর্ণমেণ্টের পরিচালকগণ—যাঁদের অনেকেই এই প্রতিষ্ঠানের পরিপোষক ছিলেন—তাঁরাই আইন দ্বারা এই প্রতিষ্ঠানকে সম্প্রতি 'যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়' (১৯৫৫ সনের আইন) রূপে উন্নীত করেছেন। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের আজও তাঁর আবক্ষপ্রতিমূর্তি প্রমথনাথের স্মৃতি বহন করছে। এবং "প্রমথনাথ ব্রোন্‌জ মেডেল" এখান হতে প্রতি বৎসর দেওয়া হয়।

ময়ূরভঞ্জরাজ্যের খনির অধিকর্তা

ময়ূরভঞ্জের রাজপরিবারের সঙ্গে প্রথমনাথের পরিবারের যোগ ছিল। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের কন্যা স্থনীতিদেবী ও স্থচারুদেবীর সঙ্গে কমলাদেবী এক স্কুলে পড়তেন। স্থনীতিদেবী সহপাঠিনী ছিলেন এবং পরে কুচবিহারের রাণী হন। তাঁর ছোট বোন স্থচারুদেবী ময়ূরভঞ্জের রাণী হন। দুইজনের সঙ্গেই আজীবন বান্ধবতা অক্ষুণ্ণ ছিল, দুই পরিবারে সর্বদা যাতায়াত ছিল। স্থতরাং প্রমথনাথ যখন ময়ূরভঞ্জ রাজ্যের খনিজের অধিকর্তা নিযুক্ত হলেন (১৯০৩ সনের শেষভাগে) তখন সকল রকম স্থযোগ ও ক্ষমতা পেয়ে রাজ্যের খনিজ-গুলিকে সন্ধানে আত্মনিয়োগ করলেন—এবং সঙ্গে সঙ্গে চেষ্টা চলল, কি করে সেই খনিজগুলিকে শিল্পকাজে লাগান যায়।

প্রমথনাথ এতদিনের অভিজ্ঞতায় অচিরে রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে উৎকৃষ্ট লৌহ-খনিজ (হিমাটাইট) আবিষ্কার করলেন। তিনি ময়ূরভঞ্জের ভূতত্ত্ব ও খনিজ সম্পদ সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ লিখলেন তা Geological Survey, Vol., 1, XXXI, Part III (1904)তে প্রকাশিত হল।

"রাজ্যের প্রধান খনিজ হচ্ছে লৌহের আকর হিমাটাইট এবং এত বেশী লৌহঘটিত ও বিস্তৃতস্থানব্যাপী খনিজ ভারতের আর কোথাও হয়ত নেই। বামনঘাটি মহকুমার এগুলি নিম্নলিখিত স্থানগুলিতে দেখা যায়।

(১) গরুমহিষানী পাহাড়ের পার্শ্বে ও তলদেশে—পূর্বদিক ছাড়া আর সব দিক—প্রায় আট বর্গমাইলব্যাপী স্থানে।

(২) বন্দগাওর কাছে সারন্দপীড় নামক স্থানে।

(৩) বামনঘাটি মহকুমার দক্ষিণ সীমায়। স্থলাইপাট—বাদাম-পাহাড়ের গায়ে ও তলদেশে—কোন্দাদেরা হতে জয়ধানপোষী—প্রায় ১২ মাইল ব্যাপী।

পাঁচপীড় মহকুমায় নানাস্থানে এই খনিজ পাওয়া যায়—সবই সিমলী পর্বতমালায়—পশ্চিম ও দক্ষিণ দিকে—কামদাবেদী ও কানটিকনা হতে টাকুরমুণ্ডা পর্যন্ত—প্রায় ২৫ মাইলব্যাপী।

ময়ূরভঞ্জের সদরেও লৌহঘটিত খনিজ আছে। —সিমলী পর্বতমালার গুড়গুড়িয়াতে; পূর্বদিকে সরষোবিলার কাছে কেন্দুয়াতে ও বদলীয়ার দুই মাইল পশ্চিমে।

সর্বশুদ্ধ কতপরিমাণ খনিজ পাওয়া যাবে তা বলা যায় না। কিন্তু আধুনিক রীতি ও আয়তনের কতকগুলি Blast Furnace (খনিজ হতে লৌহ তৈরি করার আধুনিক বিরাট যন্ত্র) এর জন্য আবশ্যকীয় খনিজ এখান হতে নিশ্চিত পাওয়া যাবে। এ সম্পদ কোনদিন নিঃশেষ হবে না। বেঙ্গল নাগপুর রেললাইনের সিনিঘাটশীলা শাখা হতে এই খনিজের স্থান কাছে—২৫ মাইলের একটা লাইন হলেই গরুমহিষানী অঞ্চল ধরা যাবে।…”

প্রমথনাথের (P. N. Bose) উপরোক্ত আবিষ্কারের বিবরণের সংক্ষিপ্ত সংবাদ ১৯০৪ সনের ১৪ই অক্টোবর তারিখে ষ্টেটসম্যানে এবং ৩রা ডিসেম্বরের The Mining Journal, Londonএ প্রকাশিত হয়।

স্থানীয় অধিবাসীরা এই লৌহ-খনিজ হতে ছোট ছোট চুল্লিদ্বারা লোহা প্রস্তুত করত। এবং সেই লোহা দিয়েই দা, কুড়ুল, তীর ও লাঙ্গলের ফলা প্রস্তুত করত। তা দেখেই প্রমথনাথ এই খনিজের আভাস পান এবং তাঁর ভূতত্ত্ববিদ্যা প্রয়োগ করে এই বিস্তীর্ণ খনিজ সম্পদের আবিষ্কার করেন।

এই সম্পদকে ব্যবহারে লাগানই তখন প্রমথনাথের কাজ হল। ময়ূরভঞ্জ রাজ্যের এই সম্পদ যদি যথাযোগ্যভাবে কাজে লাগান যায় তবে রাজ্যের প্রভূত অর্থাগম হবে এবং তদ্বারা রাজ্যের উন্নতি বিধান হবে। কারণ রাজা রামচন্দ্র ভঞ্জ ও দেওয়ান মোহিনীমোহন ধর প্রজাদের উন্নতি বিধানের জন্য উদ্যোগী ছিলেন।

টাটার লোহার কারখানা

এদিকে ভারতে লোহার কারখানা খোলার বিশেষ ইচ্ছা হওয়ায় বোম্বাইর বিখ্যাত ব্যবসায়ী জামশেদজী টাটা নিজে আমেরিকায় গিয়ে একটি কোম্পানী হতে পর পর দুইজন বিশেষজ্ঞ, ওয়েল্ড ও পেরিনকে নিয়ে এসেছিলেন। অনেক খুঁজে তাঁরা মধ্যভারতে চাণ্ডায় লৌহ খনিজ ও কয়লার সন্ধান পেয়েছিলেন ; কিন্তু তা যথাযোগ্য বিবেচিত হল না। টাটারা আশা ছাড়লেন না, ওয়েল্ডকে বললেন, "ভারতের যেখানেই হোক আপত্তি নেই। সন্ধান চলুক ; যেখানে পাওয়া যাবে, সেখানেই কারখানা খুলব।"

এমন সময় জামশেদজীর পুত্র ডোবারজী দ্রুগজেলাস্থ উৎকৃষ্ট লৌহ খনিজের বিবরণ নাগপুরের যাদুঘরে একটি মানচিত্রে দেখতে পান। সেখানে তিনি সময় কাটাতে গিয়েছিলেন। কারণ, সম্মুখের এক গভর্ণমেণ্টের আপিসের যে বড় সাহেবের সঙ্গে তিনি দেখা করতে গিয়েছিলেন তিনি একঘণ্টা পরে আসতে বলেছিলেন। ঐ মানচিত্রে প্রাপ্ত বিবরণ অনুসরণ করে তিনি জানতে পারেন যে, গভর্ণমেণ্টের ভূতত্ত্ববিদ পি. এন. বোস্ প্রায় ১৫ বৎসর আগে তা আবিষ্কার করেছেন। তৎক্ষণাৎ ওয়েল্ডকে নিয়ে তিনি ধল্লী ও রাজহরা পর্বতে চলে যান।

সেখানে বিস্তীর্ণ খনিজপূর্ণ পর্বতশ্রেণী দেখে তাঁরা খুব উৎফুল্ল হন। কারণ এখানকার খনিজে শতকরা ৬৭ ভাগই লোহা। সমস্ত পাহাড়টাই খনি। এতবেশী লোহাওয়ালা খনিজ দুর্লভ। পরে পেরিন এই স্থানটি দেখে বললেন যে, এটি পৃথিবীর উৎকৃষ্ট খনির মধ্যেও আশ্চর্য সম্পদ।

কিন্তু লোহা তৈরী করতে আরো লাগে কয়লা ও চুনেপাথর। মস্ত মস্ত চুল্লী ঠাণ্ডা করার জন্য জলও চাই। উৎপন্ন লোহা বিক্রয়ের জন্য উপযুক্ত বাজার কাছে থাকলে আরও ভাল হয় এবং মাল চলাচলের জন্য রেলগাড়ীও দরকার। অন্য সব প্রয়োজন হয়ত মিটান যায় ; কিন্তু জল ? জল কাছাকাছি কোথাও নেই। তাই স্থির হল, কারখানা খুলতে হবে অন্যত্র, খনিজ এখান হতেই মিলবে। সম্বলপুরের কয়েক মাইল পশ্চিমে মহানদীর তীরে পদমপুর গ্রামের কাছে স্থান নির্বাচিত হল। এখান হতে ঝড়িয়ার কয়লার খনি ও ধল্লী রাজহরার খনি প্রায় সমান দূরে। এইবার স্থানটির মানচিত্র তৈরি হল, কোথায় কী বসবে তার পরামর্শ ও নকসা হতে লাগল। এমন সময় খবর পাওয়া গেল জার্মানীতে জামশেদজীর মৃত্যু হয়েছে (১৯শে মে, ১৯০৪)।

এই শোক সংবাদের আঘাত কাটিয়ে উঠেই টাটারা প্রমথনাথ বসু হতে এক পত্র পেলেন। পত্রে ছিল উপরে লিখিত ময়ূরভঞ্জে আবিষ্কৃত লৌহ খনির বিবরণ। কাজেই চুনেপাথর পাওয়া যায় এবং রাণীগঞ্জ ও ঝড়িয়ার কয়লার খনি যে কাছেই তাও তিনি জানিয়ে দিলেন। কলকাতার বন্দরও কাছেই।

এই সংবাদ পেয়ে তাঁরা প্রথম সহকারী শ্রীনিবাস রাওকে পাঠিয়ে খবর নিয়ে জানলেন যে, হ্যা, অনেক লৌহ-খনিজ আছে ; কিন্তু ব্যাপারটা কত বিরাট তা বুঝতে পারলেন না। তারপর ময়ূরভঞ্জ হতে আমন্ত্রণ পেয়ে পেয়ে ১৯০৫ সনের প্রথম ভাগে ডোরাবজী, সাকলাৎওয়ালা, ওয়েল্ড ও পেরিন সেখানে এলেন।

প্রমথনাথ তাঁদের খনিতে নিয়ে গিয়ে সব দেখালেন। দেখা গেল, এই খনিজ সবই হেমাটাইট এবং তার প্রায় ৬০ ভাগই লোহা। ধল্লীরাজহরার খনিজে আরও বেশী লোহা ছিল। কিন্তু এই খনিজ রয়েছে একেবারে মাটির উপর, তুলে নিলেই হল। [১৯২৮ সন পর্যন্ত এইভাবেই কাজ চলেছে।]

এসব তাঁদের খুব পছন্দ হল। তাঁরা সিনি বলে একটা স্থান পেলেন। তার কাছে খনিজ, কয়লা ও চুনেপাথর। জলের জন্য দীঘি কাটা স্থির হল। খানিকটা কেটে দেখা গেল, জল পাওয়া গেল না। জলের জন্য তবে এমন সুন্দর স্থান ছেড়ে দিতে হবে ? তখন সন্ধান করে করে তাঁরা কালিমাটি রেল ষ্টেশন হতে মাইল দুই দূরে সুবর্ণরেখা খোরকাই নদীর সঙ্গমস্থল আবিষ্কার করলেন। তার পার্শ্বেই সাকচী গ্রামে কারখানা প্রতিষ্ঠা করা স্থির হল। এইভাবে প্রমথনাথ সাকচী গ্রামে জামশেদজী টাটার লোহার কারখানা প্রতিষ্ঠা করলেন। (ধল্লী রাজহরা হতে পরে ভিলাই কারখানা হয়েছে) সাকচীতে কারখানা তৈরী হবার প্রতিষ্ঠাদিবস হল ১৯০৮ সনের ২৭শে ফেব্রুয়ারী। ১৯০৭ সনে প্রতিষ্ঠা-পত্র প্রচারিত হয়েছিল।

এই কারখানার পঞ্চাশ বার্ষিকী উৎসব উপলক্ষে কর্তৃপক্ষ যে বিবরণী পুস্তক প্রকাশ করেছেন উপরের বিবরণীর কিয়দংশ তা হতে গৃহীত হয়েছে। কিন্তু নানা বিবরণে জানা যায় যে, যখনি কেউ তাঁকে এই আবিষ্কারের জন্য অভিনন্দিত করতেন তখনি তিনি আপত্তি করে বলতেন, "কি আর আমি করেছি। স্থানীয় লোকেরা এই খনিজ জানত, তারা তা হতে লোহা তৈরি করত। আমি টাটা কোম্পানীকে তা জানিয়েছিলাম মাত্র।" কিন্তু টাটা কোম্পানী পি. এন. বোসের দান ভোলেনি। এবং কেউ যাতে না

ভোলে সেই জন্য জামশেদপুরে ও গরুমহিষানীতে তাঁর স্মৃতিস্তম্ভাদি সযত্নে রক্ষিত আছে।

এই কারখানার প্রতিষ্ঠার আগে ময়ূরভঞ্জের খনি হতে হিমাটাইট তুলে নেওয়ার একটা চুক্তি হওয়া দরকার ছিল। কারণ এই স্বাধীন রাজ্যের এই খনির মালিক হলেন ময়ূরভঞ্জের মহারাজা। মহারাজা এই চুক্তির সর্তাদি স্থির করার ভার প্রমথনাথের উপর দেন।

এই প্রতিষ্ঠান ভারতের সর্বপ্রথম লোহার কারখানা। সুতরাং এই ব্যবসায়টি কতখানি ফলপ্রস্থ হবে তা সঠিক বলা যায় না। আবার ময়ূরভঞ্জ রাজ্যেরও আয় হওয়া চাই। এজন্য উভয় পক্ষে পরামর্শ করে স্থির হল যে প্রথম তিন চার বৎসর মহারাজাকে কিছু দিতে হবে না। তার পর বৎসর হতে খনিজের টন প্রতি আধআনা করে সেলামী তাঁকে দিতে হবে—ক্রমশ তা আট আনা হবে। প্রথম পঞ্চাশ বছরের সেলামীর গড় হিসাব করলে সাড়ে তিন আনা হবে। যতটা স্থান জুড়ে এই চুক্তি হল তা প্রায় ২০ বর্গমাইল। মহারাজা যেমন সেলামী পেলেন তেমনি তাঁর রাজ্যের মধ্যে অত বড় একটা ব্যবসায়ের প্রতিষ্ঠা হওয়াতে তাঁর প্রজারা পেল কাজ, অনেক রাস্তা ঘাট তৈরী হল, বাড়ীঘর হল, কর্মীদের সুখ সুবিধার সুযোগ হল।

এই ব্যবসায়ে ময়ূরভঞ্জের আয় শত শত বৎসর ধরে কেবল বৃদ্ধি পেতে থাকবে। আর তা সহজে আদায় হবে। সুতরাং সহজেই বলা যায় যে, সারা পৃথিবীতে অমন ঐশ্বর্য ক্বচিৎ দেখা যায়। কিন্তু এই ব্যবস্থায় প্রমথনাথ কপর্দক মাত্রও গ্রহণ করেন নি।

এই স্বাভাবিক অমায়িক পুরুষের সঙ্গে টাটার কর্তৃপক্ষদের হৃদ্যতা জন্মেছিল। প্রমথনাথের আবিষ্কার, পরামর্শ ও দূরদৃষ্টি তাঁদের বিশেষ পরিপোষক হওয়াতে তাঁরা কৃতজ্ঞতাবশে তাঁকে এই নূতন কোম্পানীতে বিনামূল্যে কিছু অংশ দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু প্রমথনাথ গ্রহণ করেন নি; কারণ তিনি নির্লোভ ছিলেন। কেউ কেউ তাঁর এই নির্লোভতার জন্য এখন আক্ষেপ প্রকাশ করে থাকেন।

আমাদের মনে হয় যে, প্রমথনাথের আত্মসম্মানজ্ঞানও অসম্মত হওয়ার অন্যতম কারণ। ময়ূরভঞ্জের মহারাজার স্বত্ব টাটা কোম্পানীতে হস্তান্তরিত করার সর্তগুলি তিনিই ঠিক করে দিয়েছিলেন। এই অবস্থায় তিনি বিনামূল্যে টাটার অংশ পেলে এই সর্তগুলি টাটার স্বার্থের অধিকতর অনুকূল বলে কীর্তিত

হতে পারে। কিন্তু আজকাল এইরূপ বৈষয়িক লেনদেনের ব্যাপারে মধ্যস্থদের এতখানি আত্মসম্মান জ্ঞান বিরল।

আরও খনিজের সন্ধান

ময়ূরভঞ্জে আরও খনিজের সন্ধান চলতে লাগল। নানা স্থানে ভূমিতে ছিদ্র করে নল বসিয়ে তিনি ভূগর্ভস্থ খনিজের সন্ধান করতে থাকলেন। এবং সে সন্ধানের ফল Records of the Geological Survey of India-র XXXIV খণ্ডে 'Notes on a Boring in the Tertiary deposit of Mayurbhanj' প্রবন্ধে লিখিত আছে। (১৯০৬)

প্রমথনাথের ময়ূরভঞ্জের চাকরীর সময়ই পাতিয়ালার রাজা ও রাজপিপলাইর রাজা তাঁকে চেয়ে নিয়েছিলেন নিজ নিজ রাজ্যের খনিজের সন্ধানের জন্য প্রমথনাথ কিছুটা দেখে দিয়েছিলেন। এই সন্ধানের ফল রয়েছে ঐ রেকর্ডের ৩৩ সংখ্যক খণ্ডে (১৯০৬)—Notes on the Geology and Mineral Resources of the Naranul District (Patiala State)। রাজ-পিপলাইর খনিজ সম্বন্ধে ঐ রেকর্ডের ৩৫ সংখ্যক খণ্ডে (১৯০৮) তাঁর প্রবন্ধ আছে—Notes on the Geology and and Mineral Resources of the Rajpiplai State.

প্রমথনাথের এই কাজের বিবরণ সমস্ত করদরাজ্যগুলিতে উৎসাহের সঞ্চার করে। ১৯০৬ সনে একবার তাঁকে কাথিয়াবাড়ে যেতে হয়। ১৯০৮ সনেই কাশ্মীরের রাজা প্রমথনাথকে আমন্ত্রণ করে নিয়ে যান।

১৯১১ সনে ত্রিপুরার মহারাজা তাঁকে কিছুকালের জন্য কার্যে নিযুক্ত করেন। তাঁর পুত্র অশোক তখন সেখানে ভূতত্ত্ববিদরূপে নিযুক্ত ছিলেন। প্রমথনাথ ত্রিপুরায় গিয়ে এই কাজে পুত্রকে সাহায্য করেন।

কালে কালে দেখা গেছে যে, আমাদের ভারতবর্ষে বহু দেশের তুলনায় বেশী পরিমাণে ও অনেকরূপ মূল্যবান খনিজ আছে। এই বাঙ্গালী ভূতত্ত্ববিদ্ অত আগে তার অনেকখানি আবিষ্কার করেছিলেন। উপরোক্ত আবিষ্কারগুলিতেই তিনি তাঁর কার্য শেষ করলেন না, শ্রীযুক্ত বি. বড়ুয়ার সঙ্গে যুক্ত হয়ে খনিজের সন্ধানের জন্য একটি প্রতিষ্ঠান খুললেন; নাম দিলেন 'The India Prospecting Company Ltd'. ১৯১২ সনে তার এক কার্য-বিবরণী

প্রকাশিত হল। হাজারীবাগ জেলায় নারাঙ্গুতে টিনঘটিত ও মনোহরপুরে সোনাঘটিত খনিজ তাঁরা পেয়েছিলেন—আর পেয়েছিলেন নানা অভ্রের খনি। ১৯১৪ সনে পুত্র আলোককে লেখা পত্র হতে জানা যায় যে, তখন তিনি বড়গুণ্ডাতে তাম্রঘটিত খনিজের সন্ধানে লাইসেন্সের জন্য উদ্যোগী হয়েছিলেন।

ভূতত্ত্ববিদ্ প্রমথনাথের কর্মজীবনের ফল

ভারত ও ব্রহ্মদেশের বিভিন্ন অংশে প্রমথনাথ কর্তৃক খনিজের সন্ধানের নানা বিবরণ পূর্ববর্তী ৬টি অধ্যায়ে বিবৃত হয়েছে। সেই অধ্যায়গুলির সঙ্গে এই পুস্তকের (গ) পরিশিষ্ট পাঠ করলে তাঁর বিস্তীর্ণ ও ফলপ্রসূ অনুসন্ধান কার্যের কথা উপলব্ধ হবে। অধ্যায়গুলিতে আছে তাঁর আবিষ্কারগুলির (১৮৮০ হতে ১৮৯৩, ১৮৯৩ হতে ১৯০৩ ও ১৯০৪ হতে ১৯১৪) বিবরণ। আর (গ) পরিশিষ্টে আছে সেই সব আবিষ্কার-প্রবন্ধের নাম ও পরিচয় যার নাম ও বিবরণ পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলিতে দেওয়া আবশ্যক বিবেচিত হয়নি।

তাঁর সন্ধান কার্যের বিস্তৃতি ও মূল্য জানার জন্য এখানে আমরা একটি তালিকা সঙ্কলন করে দিচ্ছি।

ক্রমিক নম্বর	সন	খনিজ/শিল্প	অঞ্চল
১	১৮৮৪	বিবিধ	নর্মদা উপত্যকার দক্ষিণাংশের নিমাওর ও কাওয়াতের মধ্যবর্তী স্থল।
২	১৮৮৪	লিগনাইট (নিকৃষ্ট কয়লা বিশেষ)	মধ্যভারতে রাইপুরের কাছে
৩	১৮৮৭	লৌহশিল্প ও খনিজ	রাইপুর জেলার পশ্চিমাংশ ; ধল্লী ও রাজহরা পর্বতমালা
৪	১৮৮৮	Igneous rocks (আগ্নেয় শিলা)	মধ্যপ্রদেশের রাইপুর ও বালাঘাট জেলা।
৫	১৮৮৮	ম্যাঙ্গানিজ ও ম্যাঙ্গানিজঘটিত লৌহ খনিজ	জব্বলপুর জেলা

ক্রমিক নম্বর	সন	খনিজ/শিল্প	অঞ্চল
৬	১৮৮৯	অভ্রের আকর	বরাকর ও রাণীগঞ্জ
৭	১৮৯০/৯১	কয়লা	দার্জিলিং-এর লিমু ও রামথী নদীর মধ্যস্থ ভূভাগে।
৮	১৮৯১	তামার আকর	সিকিমের পাচীখানি
৯	১৮৯৩	গ্র্যানাইট (স্ফটিক-প্রস্তর-বিশেষ)	ব্রহ্মদেশের অন্তর্গত ট্যাভয় ও মারগুই জেলায়।
১০	১৮৯৩	কয়লা	ব্রহ্মদেশের অন্তর্গত ট্যানাসিরিম উপত্যকায় টেঙু কামপিং কয়লার আকর।
১১	১৮৯৪	বিবিধ	রেওয়া রাজ্যের উত্তর পশ্চিমে।
	১৮৯৭	ঐ	মান্দালা জেলায়।
১২	১৯০০ পর্যন্ত	ঐ	বস্তার রাজ্য।
১৩	১৯০৪	কয়লা/তৈল	আসামের উম-রিলেং নদীতীর; খাসিয়া ও জইন্তিয়া পাহাড়।
১৪	১৯০৪	গরুমহিষানী প্রভৃতি স্থানে (ময়ূরভঞ্জ)র খনিজসম্পদ, হিমাটাই প্রভৃতি	তখনকার দিনের ময়ূরভঞ্জ রাজ্য
১৫	১৯০৬	খনিজ সম্পদ	পাতিয়ালা রাজ্যের অন্তর্গত নরনাউল জেলা
১৬	১৯০৬	ভূগর্ভস্থ নানা সম্পদ	ময়ূরভঞ্জ রাজ্য
১৭	১৯০৯	খনিজ সম্পদ	রাজপিপলা রাজ্য
১৮	১৯১২	দস্তা (টিন) ঘটিত খনিজ	হাজারিবাগ জেলা
১৯	১৯১৪	সোনাঘটিত খনিজ তাম্রঘটিত খনিজ	বড়গুণ্ডা

উপরের তালিকা ও পূর্বোক্ত অধ্যায়গুলি হতে দেখা যাচ্ছে যে, তাঁর ভূতত্ত্ববিদের কাজ প্রায় ৩০ বৎসর ধরে চলেছিল এবং লোহ, ম্যাঙ্গানিজ, দস্তা, তামা, কয়লা, তৈল, লিগনাইট, গ্র্যানাইট (স্ফটিক-প্রস্তর-বিশেষ), অভ্র

প্রভৃতি তাঁর অনুসন্ধানে ধরা পড়েছিল। প্রমথনাথের এই অনুসন্ধান চলেছিল নর্মদা উপত্যকায়, রেওয়া রাজ্যে, বালাঘাট, রাইপুর ও মান্দালা জেলাগুলিতে, বস্তার রাজ্যে, জব্বলপুর ও দার্জিলিং জেলায়, সিকিমে, ময়ূরভঞ্জ, রাজপিপলা, পাতিয়ালা, ত্রিপুরা ও কাশ্মীরের দেশীয় রাজ্যগুলিতে, আসাম ও ব্রহ্মদেশে।

টাটার লোহার কারখানার প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে আলোচনার সময় গরুমহিষানী ও নিকটবর্তী পাহাড়গুলির লৌহখনিজের বর্ণনা করা হয়েছে। রাইপুরের ধল্লী রাজহরা পর্বতের লৌহখনি ভিলাইয়ের লৌহ কারখানায় ব্যবহৃত হচ্ছে। সেদিকের কতক কাঁচামাল দুর্গাপুরেও আসছে।

ময়ূরভঞ্জের লৌহখনিজ-সম্বলিত পর্বতমালা বিন্ধপর্বতমালারই অংশ। এরই পার্শ্ববর্তী কেয়নঝড় জেলায় এই পর্বতমালারই আর এক অংশ অবস্থিত। এই পর্বতমালাগুলিও লৌহখনিজের আকর। কেয়নঝড়ের এই লৌহখনিজ-পর্বত দুর্গাপুর লৌহকারখানা ও উড়িষ্যার রাউলকেলার কারখানার কাঁচামাল যোগাচ্ছে। অন্য খনির মালও এইসব কারখানায় আসছে। এসব স্থানে চুনেপাথরও আছে। লৌহখনিজ হতে লৌহ নিষ্কাশনের কাজে চুনেপাথরও দরকার হয়।

ভারতের নানা অংশে দিনে দিনে নানারূপ শিল্পপ্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি হচ্ছে। প্রমথনাথের আবিষ্কৃত সব খনিজ আজও বিবিধ শিল্পে নিয়োজিত হয়নি। কালে কালে সবই হয়তো কাজে লাগবে। এই বৃহৎ বিচিত্র-ভূমিস্তর-সমন্বিত দেশে বিবিধ খনিজের আকর পাওয়া গেছে ও পাওয়া যাচ্ছে। এই খনিজ আবিষ্কারের কাজে প্রথম যে উচ্চশিক্ষিত ভারতবাসী সরকারী ও বেসরকারীভাবে দীর্ঘ ৩০ বৎসর ব্যাপৃত ছিলেন তিনি Mr. P. N. Bose (মিঃ পি. এন. বোস)।

প্রমথনাথের গৃহিনী কমলাদেবী

প্রমথনাথের কর্মজীবনের যে বিবরণ প্রদত্ত হল তা হতে দেখা যাচ্ছে যে, একাদিক্রমে সপরিবারে গৃহে বাস করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। তাই ক্রমে তাঁদের যে ৯টি সন্তান জন্মেছিল—সে বিবরণ পূর্বে দেওয়া হয়েছে—তাদের শিক্ষাদীক্ষার ভার ও সংসার পরিচালনের সম্পূর্ণ দায়িত্ব কমলাদেবী সানন্দে

গ্রহণ করেছিলেন। কমলাদেবীর নিজের কথাতেই ("স্বর্গীয়া সাধ্বী কমলাদেবীর আত্মচরিত") সে বিবরণ প্রদত্ত হচ্ছে।

"১৮৮২ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত স্বামীর সহিত নানা স্থানে ঘুরিয়াছিলাম। কিন্তু অশোক ও আলোকের পড়াশুনার বিশেষ ক্ষতি হইতেছে দেখিয়া আমি আর কোথাও তাঁহার সহিত যাই নাই। তখন আমি পার্ক ষ্ট্রীটে বাস করিতে লাগিলাম…। ১৮৯৫ খৃঃ আমার জ্বর হইল… জ্বরে এক বৎসর ধরিয়া ভুগিলাম…পেটের মধ্যে ফোড়া হইয়াছিল। কারণ বুঝিয়া…অপারেশন করার পর হইতেই জ্বর ছাড়িয়া গেল। …শরীর নিরাময় করার জন্য দার্জিলিং গিয়াছিলাম। …পুরাতন বন্ধু কুচবিহারের মহারাণী সুনীতিদেবীর সহিত পুনর্মিলন হইল… তিনি আমাকে বিশেষ আদর যত্ন করিলেন। তাঁহার বাড়ীতে যাইয়া আমরা কত গান বাজনা করিতাম।…

১৮৯৬ ডিসেম্বর স্বামী আসানসোলে একটি কয়লার খনি লিজ নিলে (স্বামীকে কলিকাতার আপিসে হাজির হইতে হইত) আমরা আসানসোলে থাকিবার বন্দোবস্ত করিলাম। ছেলেরা ওখানকার স্কুলে যাইত এবং মেয়েরা Convent এ যাইত। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে আমরা কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলাম। তিন বৎসর ধর্মতলার বাড়ীতে ছিলাম। ছেলেরা প্রেসিডেন্সি কলেজে ও মেয়েরা Conventএ পড়িত। একজন ওস্তাদের কাছে মেয়েরা গান শিখিত। ইংরাজী বাজনা ও গান একজন ইংরাজী মেমের কাছেই শিখিত।

১৯০৫ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে… বাবা বরোদায়…আমাদের লইয়া গেলেন। ছোট ক্লাসে কেবল গরীব মেয়েরাই লেস বোনা শিক্ষা করিত…আমি বাবাকে বলিলাম, সুরমা ও প্রতিমাকেও লেস বোনা শিক্ষা দিতে হইবে।…বাবা অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন।…বাবা টেনিস খেলা বড় ভালবাসিতেন। সুরমা ও প্রতিমা টেনিস খেলিত।"

পরিবারের কলিকাতা বাসের সময়কার বিবরণ প্রমথনাথের কন্যা সুষমা সেন ও প্রতিমা মিত্রের কাছে যা শুনেছি তা এই—

'নয় ভাই-বোনের সংসার মায়ের ব্যবস্থায় বড় আনন্দে কাটত। সেকালে সিনেমা থিয়েটার ছিল না। মা-ই আনন্দের আয়োজন করতেন। বাড়ীতে গানের আসর বসত। পরিবারের বহু বন্ধু আসতেন; রবীন্দ্রনাথ, ডি. এল. রায়, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি গানে যোগ দিতেন। আমরা ভাই বোনেরা গান গাইতাম। মা-ও গান করতেন। মা আমাদের ভাই বোনদের জন্য অনেক

খেলা উদ্ভাবন করতেন। মাঝে মাঝে আমাদের নিয়ে ব্রাহ্মসমাজে গিয়ে প্রার্থনায় যোগ দিতেন।

কেশব সেন, ডবলিউ. সি. ব্যানার্জি, মনোমোহন ঘোষ, বি. এল. মিত্র, পি. কে. রায়, গোখেল, নিবেদিতা, ডাঃ জগদীশ বসু, আর. এন. রায়, কে. জি. গুপ্ত, আনন্দমোহন বসু প্রভৃতি কলকাতার শীর্ষস্থানীয়দের পরিবারের সঙ্গে আমাদের যাতায়াত ছিল।

পিতামাতা ও দাদামহাশয়দের যত্নে আমরা গান বাজনা ও অভিনয়ে পটু হয়েছিলাম। আলিবাবা, ধ্রুব ও দাদামহাশয়ের 'সংসার' আমরা তাঁদের উৎসাহে অভিনয় করতাম। বাবা খুব ভাল বেহালা বাজাতেন। বৃদ্ধ বয়সেও কখনও কখনও তন্ময় হয়ে বাজাতেন, যেন কোন সুদূর কিছুর সঙ্গে তাঁর আত্মিক যোগ স্থাপিত হয়েছে।

ঠাকুরদাদা, ঠাকুরমা, কাকা ইত্যাদি আমাদের পিতৃকুলের অনেকে আমাদের পরিবারভুক্ত হয়ে এই বাড়ীতে থাকতেন। মা হাসিমুখে সংসার করতেন। রাঁচীতে বাবার অবসর যাপনের কালে আমাদের উচ্চশিক্ষিত উপার্জনশীল বড় দুই ভাই অশোক ও আলোকের পর পর অকালে মৃত্যু হয়। বাবা যেন সহজেই এ শোক কাটিয়ে উঠেছিলেন। মা তেমন পারেননি। তবু সংসারের রশ্মি তিনি ছাড়েননি।

আমাদের পিতামাতার সংসারের আনন্দের পরিবেশ প্রায় চিরদিনই যেন অক্ষুণ্ণ ছিল। বাবা মা রাঁচীতে বাড়ী করলে আমরা ছেলে মেয়েদের নিয়ে মাঝে মাঝে সেখানে সবাই মিলিত হতাম—আগের মতই আনন্দের সংসার দেখেছি। তখনকার বিরাট সম্মিলিত পরিবারের রথ মা হাসিমুখে সুব্যবস্থায় চালাতেন।'

মধু বসু (জন্ম, ১৯০০) আমাকে জানিয়েছেন—"শেষজীবনে আমি ছিলাম বাবা মায়ের সঙ্গী—১৭ বৎসর বয়সে বড়দির (সুষমা) বিয়ে হয়। অন্য বোনদেরও পরপর বিয়ে হয়ে যায়, সব অল্প বয়সেই। আমার বড় দুই ভাই অল্প বয়সেই মারা যান। তাই আমিই বাবা-মাকে বেশী দেখেছি।

হিন্দুর শাস্ত্র, বিশেষত রামায়ণ মহাভারত মায়ের বড় প্রিয় ছিল। তিনি পড়াশুনার পর রাত্রে মাঝে মাঝেই আমাদের একটি করে গল্প বলতেন। সব এই পৌরাণিক কাহিনী। বড় মধুর করে বলতেন তিনি। তা আবার তাঁকে লিখে দেখাতে হত।

তাঁকে আমরা ভক্তি করতাম, ভয় করতাম, আবার বন্ধুর মত তিনি আমাদের মনের সকল সুখ দুঃখ আশা আকাঙ্ক্ষার কথা জানতেন্। যেন যাদু জানতেন তিনি। বাবা সেই চাকরীর আমলের জীর্ণ পোষাক বদল করতে চাইতেন না—না জানিয়ে মা কখনও কখনও নূতন এনে দিতেন। মাত্র শ' চারেক টাকা পেন্সন, তাই দিয়ে রাঁচীর অতবড় সংসার—মাঝে মাঝেই ১৮।২০ জনের সংসার হত—কি করে তিনি সকল ব্যয় নির্বাহ করতেন আমরা বুঝতে পারতাম না। বাবার কোন সঞ্চয় ছিল না। মা কখনও বাবার দৈনন্দিন জীবনযাত্রা, চিন্তা ও ধ্যানের বিঘ্ন হতেন না। মায়ের এই বিস্ময়কর শক্তির উৎসের আজও সন্ধান পাইনি। আমার এমন মা না হলে প্রথম বয়সে বাবাকে অমন কর্মীমানুষ ও শেষ বয়সে ওরূপ ভগবানে সমর্পিতপ্রাণ ধ্যানী পুরুষ দেখতে পেতেন না।"

আমরা দেখেছি কমলাদেবীও ভগবানে সমর্পিত-প্রাণ ছিলেন। তিনি তাঁর আত্মজীবনীর শেষ অংশে ছেলে মেয়েদের কথা, বড় দুই ছেলের মৃত্যুর কথা ও মেয়েদের সুপাত্রস্থ করার কথা বর্ণনা করার পর লিখেছেন—

"এই জীবনের ভবলীলা সাঙ্গ করিয়া তাঁহার চরণে পৌছাইতে পারিলেই আমার জন্ম সার্থক হইবে।...আমার ন্যায় ভাগ্যবতী অতি কমই দেখা যায়। ভগবান আমায় আদর্শ বাপ, মা, স্বামী, পুত্র কন্যা সবই দিয়াছেন; আমার সংসার সোনার সংসার। তাই আজ কৃতজ্ঞতা সহকারে তাঁহার চরণে বার বার প্রণাম করি।"

প্রমথনাথের পুত্রকন্যাগণ

এই সংসারে যত মানুষের জীবনী লেখা হয় তাঁদের পুত্র কন্যাদের সম্বন্ধে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই লিখবার মত কিছু থাকে না। পিতার অর্থ, সচ্ছল সংসার (সব সময় নয়) ও জীবন, কর্মস্থলে ও অন্যত্র তাঁর সম্মান বুঝিবা সন্তানদের মনে একটা বড়-মানুষী এনে দেয় যা তাঁদের জীবনগঠন ও আত্মপ্রতিষ্ঠার অন্তরায় হয়। কিন্তু পিতামাতার কর্ম ও সৌভাগ্যের গুণে প্রমথনাথের পুত্র কন্যাদের জীবন আমাদের দেশে স্ব স্ব ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছে। পর্যায়ক্রমে সে বিবরণ দিচ্ছি।

বড়ছেলে অশোক কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়ার সময় (১৯০৪) গভর্নমেণ্টের বৃত্তি (বার্ষিক ১৫০ পাউণ্ড) পেয়ে বিলাত চলে যান। পর বৎসর তাঁর ছোট ভাই আলোকও ঐরূপ বৃত্তি পান। এই সময় বিদেশে কারিকুরি শিক্ষার সুযোগ না দেওয়ার জন্য গভর্নমেণ্টকে দোষারোপ করে বাঙ্গলা দেশে যে আন্দোলন উঠেছিল তার জন্যই সরকার হতে বৃত্তি দেওয়া আরম্ভ হয়।

অশোক বার্মিংহামে খনির কাজ ও ভূতত্ত্ববিদ্যা শিখেছিলেন। আলোক ইংলণ্ডে রসায়নশাস্ত্রে দক্ষ হয়েছিলেন। বার্মিংহাম বিশ্ববিদ্যালয় হতে অনার্স-সহ বি. এস-সি পাশ করে এসে অশোক ত্রিপুরা রাজ্যের ভূতত্ত্ববিদ নিযুক্ত হলেন (১৯০৮)। অধিকাংশ সময়ই তাঁকে রাজ্যের জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে খনিজের সন্ধান করতে হত। নানা নূতন নূতন খনিজের সন্ধান তিনি পেলেন। তাঁর কাজের বিষয় সাহায্য ও পরামর্শের জন্য ত্রিপুরার রাজা ১৯১১ সনে প্রমথনাথকেও কিছুকালের জন্য এনে রেখেছিলেন। পরের বৎসর অশোক-নাথের সেখানে জংলী জ্বর হয়। তাঁকে কলকাতায় রমেশ দত্তের বাড়ীতে এনে দীর্ঘকাল চিকিৎসা করা হয়, কিন্তু কোন ফল হয় না। এই জ্বরেই তাঁর মৃত্যু হয়। (৭ই এপ্রিল, ১৯১২ সন)। কমলাদেবী তখন সেখানেই ছিলেন। প্রমথনাথ ছিলেন রাঁচীতে। ১৯০৭ সন হতেই সেখানে তাঁর পারিবারিক গৃহ হয়েছিল।

আলোক দেশে ফিরলেন অশোকের অল্প পরেই। তিনি জামশেদপুরে টাটার কারখানায় গভর্নমেণ্টের রাসায়নিক পরীক্ষক নিযুক্ত হন। বিখ্যাত ডাক্তার মৃগেন্দ্রলাল মিত্রের কন্যা শান্তির সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। শুধু চাকরী নয়, তিনি তাঁর নিজের অধীত বিষয়ে আরও চর্চা করতেন, পিতার সঙ্গে পরামর্শ করে ভারতীয় খনিজ ও তা হতে ধাতু নিষ্কাশন বিষয়ে গবেষণা ও পরীক্ষাদি করতেন। ১৯১৮ সনের কুখ্যাত 'যুদ্ধ-ইনফ্লুয়েঞ্জা জ্বরে, জামশেদপুরে সহসা তাঁর মৃত্যু হয় (অক্টোবর, ১৯১৮)। তখন তাঁর একটি পুত্র জন্মেছিল। প্রমথনাথ নাম রাখলেন, 'আশীষ'। সেই এখন তাঁর বংশের একমাত্র পৌত্র।

এই দুই পুত্রের মৃত্যুতে প্রমথনাথের স্থৈর্য আত্মীয়স্বজনের বিস্ময় উৎপাদন করেছিল। তাঁদের তাঁকে সান্ত্বনা দিতে হয়নি। তিনিই তাঁদের সান্ত্বনা দিতেন। আলোকের মৃত্যুসংবাদের 'তার' যখন পৌছল তখন কমলাদেবী বাড়ীতে ছিলেন না। প্রমথনাথ নিজে শান্ত হয়ে থাকলেন এবং কন্যা প্রতিমাকে বললেন, 'খবরটা হঠাৎ তোমার মাকে দিয়ো না।' কমলাদেবী

মহিলা সমিতির কাজ হতে ফিরে এলে সকলে একসঙ্গে বসে দুপুরের আহার হল। প্রমথনাথ তার অনেক পরে সহধর্মিণীকে পুত্রের মৃত্যু সংবাদ দিলেন।

সুষমার বিবাহ হয় ১৯০৪ সনে। বর হলেন কেম্ব্রিজের বিখ্যাত ছাত্র ডাঃ প্রশান্তকুমার সেন। তিনি সদ্য তখন বিলাত হতে ব্যারিষ্টার হয়ে এসেছেন। তাঁর পিতা প্রসন্নকুমার সেন ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের প্রিয় সহযোগী প্রচারক-রূপে বাঙ্গালাদেশে সে সময় অতি সজ্জনজ্ঞানে আদৃত হতেন। [প্রসন্নকুমার বিলাতে কেশবচন্দ্রের ব্যক্তিগত সঙ্গী ও সচিব ছিলেন।] প্রশান্তকুমারও পিতার ভগবৎ-ভক্তি পেয়েছিলেন। বিবাহের প্রায় ৮ বৎসর আগের লেখা তাঁর "A Voice from the Sanctuary" পড়ে আমাদের মনে হয়েছে যে, ঐ বয়সেই তাঁর ভক্তির রাজ্যে অনেকখানি প্রবেশাধিকার জন্মেছিল।

কমলাদেবী লিখেছেন, এইটিই তাঁদের পরিবারের প্রথম ব্রাহ্মবিবাহ। প্রশান্তকুমার পাটনায় ব্যারিষ্টারী ব্যবসায়ে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিলেন এবং পাটনায় স্ত্রীশিক্ষা প্রচারে সুষমাদেবী বিশেষ অগ্রণী ছিলেন। সাত বৎসর আগে তিনি ভারত সভার (M. P.) সভ্য ছিলেন। এখন ৭৬ বৎসর বয়সেও তিনি কর্মক্ষম, ইংরাজী ভাষায় স্বামীর জীবনী লিখেছেন। তাঁর প্রথম বয়সের ব্যায়ামের অভ্যাস ও Convent-এর ইংরাজী পড়া, এই বৃদ্ধ বয়সেও দেহ ও ইংরাজী উচ্চারণের উপর প্রীতিকর ছাপ রেখে গেছে।

১৯০৭ সনে ব্যারিষ্টার রজতনাথের সঙ্গে সুরমার বিবাহ হয়। স্বদেশের প্রতি মমতা-হেতু রজতনাথ বিপ্লবে বিশ্বাসী ছিলেন। প্রমথনাথের কন্যা ও রমেশ দত্তের দৌহিত্রী সুরমার মনের পক্ষে স্বামীর এই বিশ্বাস প্রতিকূল হয়নি। সুতরাং রজতনাথের বিপ্লববাদ তাঁদের শান্তির অন্তরায় ছিল না। ১৯১৭ সনে রজতনাথের মৃত্যু হয়।

প্রতিমার বিবাহ হয় ১৯০৮ সনে, প্রমথনাথের সদ্য-নির্মিত রাঁচীর বাড়ীতে। বর স্বনামধন্য ব্যারিষ্টার ব্রজেন্দ্রলাল মিত্র, যিনি পরে স্যার বি. এল. মিত্র নামে পরিচিত ছিলেন। একদিকে যেমন ভারত সরকারের আইন-উপদেষ্টারূপে দেশের অন্যতম পরিচালক ছিলেন, তেমনি দেশের মঙ্গল বিধানেও সন্তবরূপ সজাগ ছিলেন। প্রতিমা দেবীর মত বিদূষী ও কর্মী সহধর্মিণী তিনি পেয়েছিলেন বলেই দেশে বিদেশে স্যার মিত্র সংযোগ স্থাপন করতে পেরেছিলেন। স্বয়ং প্রতিমাদেবী এদেশের নানা বিদ্যৎ-প্রতিষ্ঠান ও জনহিতকর সমিতির পরিপোষকরূপে সর্বত্র সম্মানিত হয়ে থাকেন। কমলাদেবীর নামে

দক্ষিণ কলকাতায় প্রমথনাথের ছোট ভাই অমিয়নাথ বসুর যত্নে একটি বালিকা বিদ্যালয় খোলা হয়। এই 'কমলা গার্ল স্কুল' এখন বিরাট প্রতিষ্ঠান হয়েছে। প্রতিমাদেবী আজ ১৪ বৎসর পরিচালক সমিতির সভানেত্রী। স্কুলের একলক্ষ টাকার সম্পত্তি হয়েছে এবং গভর্নমেণ্ট হতে তিনলক্ষ টাকা দান পেয়ে নিজের বাড়ী তৈরী হয়েছে। আরও দান আসছে।

অমরনাথ দাঁতের চিকিৎসক হয়ে জামশেদপুরে ব্যবসায় আরম্ভ করেন। তাঁর বড় ভাই আলোকনাথ জামশেদপুরে কাজ করার সময় পিতার গরুমহিষানী খনি আবিষ্কার ও তদ্‌হেতু জামশেদপুরে টাটার লোহার কারখানা স্থাপনের বিবরণ স্থানীয় পত্রিকায় প্রকাশ করেছিলেন বলে কর্তৃপক্ষীয়দের কাছে তিনি তিরস্কৃত হয়েছিলেন। কিন্তু অমরনাথের ভাগ্য অন্যরূপ ছিল। জামশেদপুর Wire and Steel Foundry-র জেনারেল ম্যানেজার নগেন্দ্রনাথ রক্ষিত ও মালিক আগরওয়াল একটি বিরাট জনসভার আয়োজন করে টাটা কোম্পানীর অন্যতম স্রষ্টারূপে প্রমথনাথকে সম্বর্ধনা করতে উদ্যত হলেন। টাটার ম্যানেজিং ডাইরেক্টর মিঃ দালালও তাতে যোগ দিলেন। তাঁকে আনতে মোটর গাড়ী পাঠান স্থির হল। কিন্তু প্রমথনাথ আসতে রাজী হলেন না। উদ্যোক্তাদের বিশেষ অনুরোধে অবশেষে রাজী হলেন, কিন্তু গাড়ী পাঠাতে বারণ করলেন।

"আমাকে চাঁইবাসায় দেখা করতে 'তার' করলেন। সেখান থেকে বাবাকে আমি গাড়ী করে নিয়ে এলাম। আমার ব্যবসায়ের সেই প্রথম আমলে চার দিন আমার ছোট্ট বাড়ীতে তিনি ছিলেন। তা আমার সারাজীবনের সম্পদ হয়ে আছে। বিরাট সে সম্বর্ধনা সভা, আলোকসজ্জায় যেন অমরাপুরী। বহু সম্মানে তিনি ভূষিত হলেন। কিন্তু সবিনয়ে তিনি বললেন, 'আমি এমন কি করেছি যার জন্য এত আমার প্রাপ্য হবে'?

মধু অমরনাথের মতই রাঁচী জেলা স্কুলে পড়াশুনা করতেন। তারপর তিনি কলকাতায় পড়াশুনা শেষ করেন। বাল্যাবধি অভিনয়ে তাঁর বিশেষ দক্ষতা জন্মে এবং পরে ব্রহ্মানন্দ কেশব সেনের পৌত্রী সাধনার সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। সাধনাদেবীরও অভিনয়ে খুব খ্যাতি। এখন দুজনেই মঞ্চ ও ছায়া-শিল্পীদের মধ্যে প্রবীণ হয়েছেন।

কন্যা পূর্ণিমার বিবাহ হয় ১৯১৪ সনে। বর অমূল্যচন্দ্র বসু, টাটা কোম্পানীর ফুয়েল ইঞ্জিনিয়ার। ইনি বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইন্‌ষ্টিটিউটের ছাত্র ছিলেন ও তখন প্রমথনাথকে রেকটর রূপে সেখানে মাঝে মাঝে দেখতেন। আমেরিকায়

যখন উচ্চতর শিক্ষায় ব্রতী ছিলেন তখনও নিজ কর্মস্থলে মালিকের মুখে টাটা কোম্পানীর অন্যতম স্রষ্টারূপে প্রমথনাথের নাম উচ্চারিত হতে শুনেছিলেন। দেশে এসে সেই বিখ্যাত মানুষের কন্যকে বিবাহ করলেন। অমূল্যচন্দ্রের এই বৈশিষ্ট্য আমরা শুনেছি যে, বাঙ্গালী, বিশেষত ব্রাহ্ম, কেউ জামশেদপুরে জীবিকার অন্বেষণে গেলে তিনি তাকে অতি দ্রুত কর্মে নিযুক্ত করে দিতেন এবং এই কার্যে পূর্ণিমাদেবী তাঁকে নিরন্তর উৎসাহিত করতেন। পিতার মৃত্যুর সময় সন্তানদের মধ্যে একমাত্র ইনিই কাছে ছিলেন। সুষমা, সুরমা, অমরনাথ বিলাতে ছিলেন। প্রতিমা ছিলেন দিল্লিতে, উমা নোয়াখালিতে ও মধু কলকাতায়।

আই. সি. এস. জ্ঞানাঙ্কুর দের সঙ্গে কনিষ্ঠা কন্যা উমার বিবাহ হয় ১৯২০ সনে। স্বামী নানা জেলার কর্তা হয়েছিলেন এবং শেষে বাঙলা গভর্নমেণ্টের বিশেষ বিশেষ কর্মে নিযুক্ত হয়েছিলেন। এইসব কর্মে স্বামীর সহায়তা করার মত আবশ্যকীয় শিক্ষা-দীক্ষা বাল্যকাল হতেই ইনি অর্জন করেছিলেন।

রাঁচীর অধিবাসী উচ্চশিক্ষিত এক বৃদ্ধ—যিনি প্রমথনাথকে জানতেন, জানিয়েছেন, 'রাঁচীর বাঙ্গালী বালকদের জন্য উচ্চ ইংরাজী স্কুল স্থাপনে তিনি বিশেষ সাহায্য করেছিলেন, কিন্তু প্রসঙ্গত বলেছিলেন যে, উচ্চ ইংরাজী স্কুল কলেজ মেয়েদের জন্য না করাই ভাল। অথচ তিনি প্রথম জীবনে সাহেব ছিলেন বলে শুনা যায়।'

এই প্রসঙ্গে মধু বসু বলেন, "তাঁর সরকারী চাকরীর কালে ওরূপ পদে তিনিই প্রথম ভারতীয়, আর সবাই সাহেব। সেকালে চাকরীর খাতিরে আমার দাদামহাশয় পোষাক ইত্যাদিতে যেরূপ সাহেব ছিলেন, বাবাও ততখানি সাহেব; দুইজনেই বাবুর্চি রাখতেন। এই খোলসটা দুইজনেই ঝেড়ে ফেলেছিলেন—সরকারী চাকরী ছাড়ার পর। এদের মধ্যে যে ভারতীয় কৃষ্টি চিরদিন ক্রিয়া করেছে তা পরবর্তী জীবনে নিরঙ্কুশ গতিতে চলেছিল। আমার বোনেরা Conventএ পড়েছিলেন, কিন্তু বেশী উচ্চশিক্ষা নেবার আগেই বাবা মা তাঁদের বিয়ে দিয়ে দিয়েছিলেন।"

রাঁচীতে প্রমথনাথ

এই চিন্তাশীল, স্থিরবুদ্ধি ও নিরহঙ্কার মানুষটির যে পরিচয় আমরা পেয়েছি তাতে কোন কোলাহল-মুখরিত নগরে বাস করা তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক হত না। তাই সরকারী চাকরী ছাড়ার পর বাড়ীর জন্য স্থান নির্বাচনে তিনি উদ্যোগী ছিলেন। নির্বাচিত হল রাঁচী—তখনও সেখানে যাবার রেললাইন হয়নি, হবার আয়োজন চলছে। মানুষঠেলা পুষপুষ গাড়ীতে করে সেখানে পৌছলেন এবং আম জাম কাঁঠাল পেঁপে পেয়ারা ইত্যাদি ফলের বাগান সমেত ২১ বিঘা জমির একটি বাগান কিনলেন (১৯০৭)। সুন্দর একটি বাড়ী করলেন তার উপর এবং সপরিবারে সেখানে বাস আরম্ভ করলেন।

নিজে পরিশ্রম করে ক্রমশ বাগানটিকে তিনি সুসজ্জিত করলেন। পুকুর কাটালেন, চবুতরা বাঁধালেন। ক্রমে স্থানীয় লোকেদের সঙ্গে পরিচিত হলেন, ধীরে ধীরে স্থানীয় ব্যক্তিদের মধ্যে তাঁর প্রভাব ছড়িয়ে পড়ল। অমায়িক হৃদয়বান ব্যবহার, বিস্তীর্ণ জ্ঞান এবং সৎ পরামর্শের জন্য তাঁর কাছে কত লোক আসত। বাঙ্গালা দেশের অন্যতম নেতা প্রমথনাথ তাঁর নিজের অজ্ঞাতে রাঁচীর একান্ত আপনজন হয়ে পড়লেন। ওখান হতে আর অন্যত্র যেতে চাইতেন না।

আগেই যে লেখার অভ্যাস ছিল এখানে তা দৈনন্দিন জীবনের এক অঙ্গ হয়ে দাঁড়াল। কখনও এদেশের কোন জাতীয় আন্দোলনের গতি লক্ষ্য করে তিনি প্রবন্ধ, পুস্তিকা বা বই লিখতেন। কখনও বা শিক্ষা, স্বাস্থ্য বা ভারতীয় সভ্যতার প্রসারের জন্য আন্দোলন উপস্থিত করতেন। এই সব লেখার বিবরণ পরিশিষ্টে আছে। পরবর্তী অধ্যায়ে তাঁর লেখার নিদর্শন দেওয়া হবে। সেখানেই দেখা যাবে, তাঁর চিন্তা কতদিকে প্রবাহিত হত এবং অনেক চিন্তা যেন আজও প্রযোজ্য মনে হয়।

জীবনের শেষ কয় বৎসর এই সত্যানুরাগী মানুষটিকে প্রায়ই ক্ষোভ প্রকাশ করতে দেখা যেত, "আইন ও চিকিৎসা ব্যবসায় সমাজের অতিশয় মঙ্গলকর শ্রদ্ধেয় জীবিকা। কিন্তু মানুষ এতখাতি আদর্শচ্যুত হয়েছে যে, এই শ্রদ্ধেয়গণ ওই সৎপথ পরিত্যাগ করে সমাজের শত্রু হয়েছেন।"

রাঁচীর দাতব্য সমিতি, ক্লাব ও লাইব্রেরীর সঙ্গে তাঁর যে সংযোগ হয়েছিল তা আজীবন ছিল। ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়ের পরিচালক সমিতির সক্রিয় সভ্যরূপে

তাঁর হাত দিয়ে স্বাস্থ্য ও শিক্ষা পদ্ধতির অনেক উন্নতি বিধান হল। মানসিক হাসপাতালের পরিদর্শক হয়ে রোগীদের নানা স্বাচ্ছন্দ্য বিধান করলেন। তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগে ছোটনাগপুর গো-রক্ষিণী ও জাতি স্থধার সভা আদিম অধিবাসীদের মধ্যে গোমাংস খাওয়া ও মদ্যপান অনেক কমিয়ে দিল। এইভাবে বিহার প্রদেশে তিনি নানা কাজে নেতৃত্বের সম্মান পেলেন। বিহার প্রদেশের নেতাদের যে জীবন চরিত লেখা হয়েছে—সৎ-চিদানন্দ সিংহ বিরচিত 'গ্রেট মেন অব বিহার'—তার মধ্যে প্রমথনাথও আছেন।

তাঁর স্ত্রীও রাঁচীতে মহিলা সমিতি ও বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। সমিতি দুঃস্থদের অভাব মোচনের জন্য নানা ব্যবস্থা করতেন। বিদ্যালয়টির মানও ক্রমে উন্নত হতে থাকে। এইসব প্রতিষ্ঠানের অর্থাগমের স্থবিধার জন্য কমলাদেবী তাঁদের বাড়ীতে বৎসরে একবার করে মেলা বসাতেন এবং নিজের ছেলেমেয়েদের দিয়ে কখনও কখনও অভিনয় করাতেন।

কলকাতার সমাজের সঙ্গেও প্রমথনাথের যোগ ছিল। ১৯১৬ সনে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন তাঁকে যশোহর অধিবেশনে বিজ্ঞান শাখার সভাপতি নির্বাচিত করেন। ১৯২২ সনে কুশদহ সমিতির সভাপতি হয়ে বহুকাল পরে তিনি স্বগ্রামে গিয়েছিলেন। তখন ওখানকার সমান তাঁকে সাদরে গ্রহণ করেছিল। ১৯৩০ সনে কাশিমবাজারের মহারাজা, কুমার কৃষ্ণ দত্ত প্রভৃতি দ্বারা আহূত 'ভারত সাধনা শিক্ষা সম্মিলনে' তিনি সভাপতি হয়েছিলেন। কলকাতার বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ রাঁচীতে স্বাস্থ্যলাভার্থ গেলেই প্রমথনাথের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে তাঁর স্নেহভাজন হতেন।

দিন যাপন

১৯১৪ পর্যন্ত প্রমথনাথের কর্মজীবনের বিবরণ সংক্ষেপে পূর্বের অধ্যায়গুলিতে দেওয়া হয়েছে। এই সময়ে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৯ বৎসর। এর পর আর তাঁকে অর্থোপার্জনে নিযুক্ত দেখা যায়নি। তারপরও ১৯৩৪ সনের ২১শে এপ্রিল পর্যন্ত তিনি বেঁচেছিলেন। সেদিন মাত্র তিন দিনের নিউমোনিয়া রোগে রাঁচীর বাড়ীতেই সহসা তাঁর মৃত্যু হয়। এই দীর্ঘ জীবনে তাঁকে কখনও রুগ্ন দেখা যায়নি, কোন চিকিৎসক তাঁকে দেখেননি; যদি কখনও সামান্য কিছু

অসুস্থতা দেখা গেছে, তিনি নিজেই তার জন্য নিজের বাগান হতে গাছড়া আনিয়ে সেই ঔষধ খেয়ে সহজে আরাম হতেন।

তাঁর স্বাভাবিক রক্তাভ ফর্সা রং দিন দিন আরও কান্তিময় হয়েছিল। মনে ছিল অপার শান্তি ও তৃপ্তি; যদিও স্বজন সমাবেশ হেতু মাঝে মাঝেই রাঁচীর বাড়ীতে খরচ অত্যন্ত বৃদ্ধি পেত। অথচ বাড়ী, বাগান, ৪১৩ টাকা মাসিক পেন্সন ও মাত্র ৪০০০ টাকার কোম্পানীর কাগজ তাঁর সম্বল ছিল বলে তাঁর ভাগিনেয় প্রফুল্লকুমার মিত্র জানিয়েছেন। প্রমথনাথ এত নিরুদ্বেগ ছিলেন যে, ঐ ৪০০০ টাকার কাগজও তিনি প্রফুল্লচন্দ্রকে তাঁর ব্যবসার প্রয়োজনে দিতে চেয়েছিলেন।

কেমন করে তিনি এই স্বাস্থ্য ও নিরুদ্বেগতা পেলেন তা জানতে আমাদের কৌতূহল হয়। যে শক্তি তাঁকে বার বার পুত্রশোকে সান্ত্বনা যুগিয়েছিল, যে দৈনন্দিন জীবনযাত্রা তাঁকে বৃদ্ধ বয়সেও সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘ ৭৯ বৎসরের আয়ু দিয়েছিল এখন আমরা তারই আলোচনায় প্রবৃত্ত হব।

গ্রীষ্মকালে শেষ রাত্রি সাড়ে চারটায়, শীতকালে সাড়ে পাঁচটায় শয্যাত্যাগ করেই ছাদে চলে যেতেন। কিছুক্ষণ দ্রুত পদচারণা করার পর বসে ধ্যান ও প্রাণায়াম ব্যায়াম করতেন। নীচে নেমে এসে যখন পায়খানায় যেতেন তখন পূর্বদিক সবে লাল হয়েছে। জামা কাপড় ছেড়ে তিনি একলাই আহারে বসতেন। তখন পরিবারের কেউ ওঠেনি। নিজের একটি জালের আলমারীতে সব থাকত। তিনি নিজে চাবি খুলে তা হতে খেতেন। গরমজলে লেবুর রস, ভিজা ছোলা ও আদা, গরম দুধ, নিজের বাগানের যে কোন ফল, ডিম, রুটি ও নিজের গরুর দুধের সন্দেশ। এই আলমারীতে পিঁপুল চূর্ণ থাকত। প্রয়োজন মত তা তিনি খেতেন।

আহারের পরই তিনি নিজের গোশালা ও বাগানের কৃষিকার্যের তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত হতেন। সাড়ে আটটায় ফিরে এসে অফিস ঘরে বসতেন। চিঠিপত্র, প্রবন্ধ ও বই লেখা ও পড়ায় কাটত ঠিক এগারটা পর্যন্ত। দাড়ি কামিয়ে ও গায়ে তেল মেখে নিজের পুকুরে স্নানে নেমে সাঁতার কাটতেন। কোন চর্মরোগ হলে গায়ে নিজেই মাটি মাখতেন। দুপুরের আহার হত বারটায়— ভাত, ডাল, নিরামিষ ঝোল, ক্বচিৎ কোন তাজা ছোট মাছ, অম্বল, দৈ, কলা ও পায়েস।

খেয়ে উঠে আট দশ মিনিট তামাক খেয়ে এক ঘণ্টা নিদ্রা যেতেন।

উঠে আবার লেখা পড়া চলত চারটা পর্যন্ত। তখন একটু জলযোগ করতেন; গরম জলে লেবুর রস, দুধ, ডিম, রুটি, কলা। চা কখনও খেতেন না। চিড়া, মুড়ি, খৈ, দৈ প্রিয় খাদ্য ছিল। তা পেলে অন্য খাদ্য বাদ পড়ত।

বিকেলে ভ্রমণে বের হয়ে সভা, সমিতি, বন্ধু বান্ধবের বাড়ীতে যেতেন। ফিরে এসে বাগানে বসে খানিকক্ষণ ধ্যানস্থ থাকতেন। কোন কোন দিন তন্ময় হয়ে বেহালা বাজাতেন—প্রায় প্রত্যহই তাস খেলতেন। সাথী হতেন প্রতিবেশী জয়কালী দত্ত, কালীপদ ঘোষ এবং বাড়ীর কোন মহিলা।

রাত্রির আহার হত আটটায়। দুইটি চাপাটি, ডাল, নিরামিষ তরকারির ঝোল, আর পায়েস। প্রায় দশ মিনিট তামাক খেতেন, তারপর শয্যা গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত ঘণ্টা খানেক নীরবে ধ্যান করতেন।

বাড়ীতে বাবুর্চি ছিল। তাঁর রান্না পৃথক পাচক করত। তাঁর পোষাক ছিল সম্পূর্ণ ভারতীয়ের; কালো পেড়ে ধুতি ও পাঞ্জাবী। উপরোক্ত দিনযাপনের পদ্ধতির কোন নড়চড় ছিল না। বাড়ীতে কোন বিবাহ, অনুরূপ উৎসব কিম্বা শোক তাঁর এই কার্যক্রমের কোন ব্যতিক্রম একদিনের জন্যেও করেনি।

প্রমথনাথের এই দৈনন্দিন জীবন এই পরিণত বয়সের মানুষটির চিত্তের গঠনের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করে। তিনি নিয়েছিলেন পাশ্চাত্ত্যের নিয়মানুবর্তিতা, গৈপুরের বাল্যে দেখা কৃষি-নির্ভর স্বাস্থ্যকর সহজ জীবনযাত্রা এবং ভারতীর কৃষ্টির ভগবৎ-নির্ভরতা।

প্রমথনাথের ধর্ম

আমরা দেখেছি, প্রমথনাথ বিবাহের সময় হিন্দুধর্ম ছাড়েননি। রাঁচীতে রামকৃষ্ণ সমিতির নানা অনুষ্ঠানে যোগ দিতেন, সে বিবরণ পাওয়া যায়। তাঁর প্রায় সকল কন্যাদের বিবাহই ব্রাহ্মমতে হয়েছিল। পুত্রদেরও তাই। তাঁর পুত্র কন্যারা তাঁর শ্রাদ্ধ করেছিলেন ব্রাহ্মমতে। তিনি দীক্ষিত ব্রাহ্ম ছিলেন না। ব্রাহ্মদের কোন অনুষ্ঠানে তাঁকে ডাকলে তিনি জয়কালী বাবুকে নিয়ে যেতে বলতেন। ডোরাণ্ডা হতে আপিসের বাবুদের আমন্ত্রণ করে এনে বাড়ীতে কীর্তন শুনতেন। এবং পাছে তাঁদের দ্বিধা হয় তাই নিষ্ঠাবান হিন্দু দ্বারা তাঁদের পরিবেশন করে খাওয়াতেন।

কোন কোন দিন সন্ধ্যায় বেহালা বাজাবার সময় সুকণ্ঠে গান করতেন—

'মন একবার হরি বল।
হরি হরি হরি বলে ভবসিন্ধু পারে চল।'

অথবা

"দিবা অবসান হল, কি কর বসিয়া মন,
উত্তরিতে ভবনদী, করেছ কি আয়োজন ?"

বাড়ীতে দেবদেবীর ছবি রাখায় আপত্তি করতেন না। দিনের খানিকটা সময় তিনি ধ্যানে কাটাতেন, সে বিবরণও জানা যায়। আমাদের মনে হয় হিন্দুধর্মের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা কোন দিনই শিথিল হয়নি। কিন্তু তাঁর সংস্কারমুক্ত মন বিশ্বমানবতা ও ধর্মেরই পোষক হয়েছিল। আমাদের বক্তব্যের সমর্থন তাঁর নিম্নলিখিত লেখাগুলিতে পাওয়া যাবে।

"আজকাল হিন্দুধর্মের উপর নব্যবঙ্গের অতিশয় উৎসাহ দেখা যাইতেছে। সেই নবানুরাগের প্রধান কারণ, হিন্দুধর্ম জাতীয় ধর্ম। আমাদের জাতীয় জীবনের অঙ্কুর রোপিত হইয়াছে—জাতীয় ধর্ম জাতীয় আচার ব্যবহারের উপর অনুরাগ ক্রমশ প্রবল হইতেছে। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাই যে আমাদের নবজীবন প্রভাতের মূলীভূত কারণ, তাহা কোন···বিচারক অস্বীকার করিবেন? ····বিজ্ঞানের বলে আমাদের জাতীয় জীবনের সঞ্চার হইয়াছে।···

হিন্দুধর্মের সহিত বিজ্ঞানের অসামঞ্জস্য নাই। হিন্দুধর্ম পরিবর্তনশীল, তাই উন্নতিশীল, তাই বিজ্ঞানের বিরোধী নহে, তাই ইহার স্থায়িত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ নাই।···জগৎপ্রসূতি মহাদেবীর আরাধনা করিতে যে ধর্ম উপদেশ দেয়, যে ধর্মে বুদ্ধদেব অবতার মধ্যে গণ্য, যে ধর্ম চার্বাকাদি নিরীশ্বরবাদিদিগকেও আশ্রয় দেয়, সেই ধর্মের বিনাশ অসম্ভব।

কিন্তু হিন্দুধর্ম হিন্দুসমাজের সহিত জড়াইয়া পড়িয়াছে। হিন্দুদিগের সামাজিক নিয়ম ধর্মের নামে প্রচলিত। সামাজিক নিয়ম রক্ষা না করিলে ধর্মচ্যুত হইবে। এই সকল নিয়মের সহিত ধর্মের বাস্তবিক কোন সম্পর্ক নাই। যদি উহাদের কোনটি উন্নতি-বিরুদ্ধ বলিয়া পরিত্যক্ত হয়, তাহা হইলে হিন্দুধর্মের কোন ক্ষতি হইবে না। হিন্দু সমাজের পরিবর্তন হইবে সত্য, কিন্তু পরিবর্তন উন্নতির সহচর।·· পরিবর্তনশীল না হইলে ব্যক্তি বিশেষের ন্যায়, সমাজেরও উন্নতি সম্ভবে না। কিন্তু···যে পরির্তনে উন্নতি সম্ভব, কেবল তাহাই অবলম্বনীয়।

সমাজের যে সকল প্রথা স্পষ্টরূপে ধর্মবিরোধী, নীতি-বিরোধী ও হানিজনক নহে, সেগুলি যেন আমরা রক্ষা করি। পাশ্চাত্য শিক্ষার সুফলের সঙ্গে সঙ্গে কুফলও ফলিতেছে। সুফলের গাছগুলিই আমরা যত্ন করিব। কতকগুলি বৃক্ষে ফল ধরিয়াছে ; তন্মধ্যে যে যে বৃক্ষের ফল মিষ্ট, কেবল তাহাই রক্ষণীয়।" (হিন্দুধর্মের নবজীবন, নবজীবন পত্রিকা, ১২৯২ সাল)

প্রমথনাথের বাংলা লেখা খুব কম, ইংরাজী লেখাই বেশী। তাই ইংরাজী লেখা তরজমা সমেত উদ্ধার করা হল—

"From the time of the Upanishadas, the aim of the Hindu has been to know the One by calm meditation undisturbed by mundane thoughts or, in later times to be lost in ecstatic love for Him. To the practical European, a Ramakrishna spending his whole life in meditation and deovtional exercises in calm ratirement, or a Chaitanya dancing in the streets in frenzied love for his Deity, may appear as at best, a visionary enthusiast. These 'dreamers' however have a philosophy of their own, which would make out the practical European, engaged in a perpetual struggle for thc betterment of his fortune, as a hunter after shadows.

The extent of the influence still exercised by such 'dreamers' is not known. They rerely, if ever, appear in newspapers ; what they do is done in silence and secrecy. We were surprised to find last year that the Gonds of an extensive tract in the Rewa State (Central India) had given up drinking ; and on enquiry we found out the reason to be the fiat of a Yogi who had visited the State the year before.

His order had gone forth from village to village, and the Gonds without question had become total abstainers. No crusade against intemperence could have produced such a wonderful and wide-spread result. There are no doubt charlatans among the Yogis who live upon the credulity of

ignorant people. But there can not be the shadow of a doubt that there are also genuine men among them, who devote their lives to spiritual culture in a manner inconceivable to the European."

"উপনিষদের সময় হতে, হিন্দুদের লক্ষ হল শান্ত ধ্যানের দ্বারা সেই একমেবদ্বিতীয়মংকে জানা, অথবা পরবর্তী কালে তাঁর প্রেমে তন্ময় হওয়া। রামকৃষ্ণের মত নিভৃতে ধ্যান ও পূজায় কাটিয়ে দেওয়া, বা চৈতন্যের মত ভগবৎপ্রেমে গান করে করে পথে পথে নৃত্য করা একজন বস্তুতান্ত্রিক ইউরোপীয়ের কাছে স্বপ্নবিলাস বলে মনে হতে পারে। কিন্তু এই বিলাসীদের নিজেদের একটা ধর্ম বিশ্বাস আছে। সেই দৃষ্টিতে, এই ইউরোপীয়দের সারা-জীবন ধরে অধিকতর অর্থার্জনের দ্বারা সাংসারিক অবস্থার উন্নতির জন্য ছোটাকে, হয়ত ছায়ার পিছনে ছোটার সঙ্গে তুলনা করতে হয়।

এই স্বপ্নবিলাসীদের প্রভাব এখনও সমাজে কতখানি ছড়িয়ে আছে তা সঠিক বলা যায় না বটে। তাদের কথা সংবাদপত্রে বড় একটা প্রকাশিত হয় না। শান্ত ও প্রচ্ছন্ন তাঁদের জীবন সাধনা। গত বৎসর আমরা দেখে বিস্মিত হয়েছিলাম যে রেওয়া রাজ্যের (মধ্য প্রদেশ) বিস্তীর্ণ স্থানব্যাপী সেখানকার গোন্দজাতি তাড়ি, পচাই ইত্যাদি মাদক দ্রব্য খাওয়া ছেড়ে দিয়েছে এবং সন্ধান করে জানা গেল যে আগের বছর এক যোগীপুরুষ এদের মধ্যে বেড়াতে এসেছিলেন।

তাঁর আদেশ গ্রাম হতে গ্রামান্তরে ছড়িয়ে গিয়েছিল এবং গোন্দেরা বিনা প্রশ্নে মাদকদ্রব্য একেবারে ছেড়ে দিয়েছে। মাদকের বিরুদ্ধে কোন আন্দোলনই এত বিস্তীর্ণ ও আশ্চর্যজনক ভাবে ফলপ্রসূ হত না। অজ্ঞান লোকেদের উপর তাদের অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে যায়, সংসারে এমন যোগীর অভাব নেই সত্য। কিন্তু কিছু মাত্র দ্বিধা না করে বলা যায় যে, তাঁদের মধ্যে খাঁটি মানুষ আছেন যাঁরা ধর্মজীবনের এমন উচ্চ স্তরে উঠেছেন যা কোন ইউরোপীয়ের ধারণার অতীত।" (ভাবার্থ)

"There are many other indications of the dominant influence of religion upon the Hindu mind. From the earliest times till very recently the chief use which a well-to-do Hindu, be he king or subject, has made of his wealth is in

buiiding temples and guest houses, digging wells, tanks and similar works for the public benefit. Among the ruins of Hindu cities, temples are often the only and certainly always the most prominent features ; we scarecely meet with the remains of palaces or other secular buildings.

The major portion, if not all of the Hindu are spent upon religious purposes. No doubt, most of these purposes are what we would call superstitions. But there is scarcely a religion professed by any considerable section of mankind which is altogether free from superstition. The question is only one of degree. Any how, we may condemn the superstition, but we must reverence the spiritual temperament, the temperament which places the spiritual above the animal man."

তাৎপর্য—"হিন্দুর মনে ধর্মের ক্রিয়া কত গভীর ও সুতীব্র তার নানা বহিঃপ্রকাশ দেখা যায়। প্রাচীনকাল হতে আরম্ভ করে এই সেদিন পর্যন্তও রাজাই হউন আর প্রজাই হউন—সম্পন্ন হিন্দু মাত্রেই ধনের ব্যবহার করেন মন্দির ও অতিথিশালা নির্মাণে, কূপ ও পুষ্করিণী খননে বা ঐরূপ কোন জনহিতকর কাজে। ধ্বংসপ্রাপ্ত প্রাচীন হিন্দু নগরের মধ্যে মন্দিরগুলিই প্রধানতঃ দেখা যায়। সেখানে প্রাসাদ বা ঐ রূপ ব্যক্তিগত অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষ বড় দেখতে পাওয়া যায় না।

যদি সম্পূর্ণও না হয়, তবু প্রায় সব সঞ্চয়ই হিন্দুরা ধর্মানুষ্ঠানে ব্যয় করেন। সন্দেহ নাই যে এই সব অনুষ্ঠানকে প্রায়ই আমরা 'কুসংস্কার' বলে থাকি। কিন্তু সংসারে যে-কোন ধর্মই অনুষ্ঠিত হউক, তার অনুষ্ঠাতাদের সংখ্যা যদি মানবজাতির মধ্যে গণনীয় হয় তবে একেবারে সংস্কারমুক্ততা কোথাও দেখা যায় না। কেউ বা কম, কেউ বা বেশী। যাই হোক্, আমরা কুসংস্কারের নিন্দা করতে পারি কিন্তু আধ্যাত্মিক বৃত্তির প্রতি আমাদের সম্মান দেখান দরকার। এই আধ্যাত্মিক বৃত্তিই তো মানুষকে পশুত্বের উপরে নিয়ে যায়।"

আচার্য প্রমথনাথের রচনা

প্রমথনাথের বয়স যখন ১৫ বৎসর (১৮৭১) তখন হতেই তিনি গ্রন্থকার ('অবকাশ কুসুম)। বিলাতে থাকা কালে Indo-Aryan Civilization (১৮৭৭) এবং Caste system in India : its origin and history (১৮৮০) সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখেছিলেন। প্রথমটির জন্য পুরস্কার পেয়েছিলেন, আর দ্বিতীয়টি হল ব্রিষ্টল সহরের যাদুঘর ও পাঠাগারে প্রদত্ত বক্তৃতা। সেখানেই ভূতত্ত্ববিষয়ক দুটি প্রবন্ধ লেখেন (১৮৮০)। এসব বিবরণ এই পুস্তকের যথাস্থানে দেওয়া হয়েছে।

তারপর হতে প্রায় মৃত্যু পর্যন্ত (১৯৩৫) অজস্র প্রবন্ধ, পুস্তিকা ও পুস্তক তিনি রচনা করেছিলেন। এসবের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও তালিকা এই পুস্তকে আছে। তাঁর বিখ্যাত পুস্তক A History of Hindu Civilization during the British Rule (1894)-এর বিবরণাদি এই পুস্তকের নানা স্থানে দেওয়া হয়েছে।

১৯০৯ সন পর্যন্ত তাঁর ভূতত্ত্ববিষয়ক অনুসন্ধান-প্রবন্ধ পাওয়া যায়। তার পর হতে দেশের কিসে মঙ্গল হবে সেই চিন্তার ধারা তাঁর লেখয় দেখা যায়। এই সময় তিনি ভূতত্ত্ব সম্বন্ধীয় প্রবন্ধাদি রচনা করেননি, যদিও ও-বিষয় নানা তথ্যপূর্ণ পত্রাদি লিখেছেন।

তাঁর রাঁচীতে বাস আরম্ভ হয় ১৯০৭ সন হতে। তারপর হতেই এদেশ তাঁকে পায় চিন্তাশীল ও জ্ঞানী প্রচারক রূপে। তাঁর লেখায় প্রকাশিত হত গভীর জ্ঞান ও প্রবল স্বদেশানুরাগ। তাঁর Epochs of Civilization (১৯০৩) ৩০৯ পৃষ্ঠার বৃহৎ গ্রন্থ। পৃথিবীর সভ্যতার ইতিহাসকে তিনি তিনটি যুগে ভাগ করেছেন, এবং তুলনা করে দেখিয়েছেন কিসে মানুষের মঙ্গল, কেন জাতি বা সভ্যতা নষ্ট পায় এবং কেন ভারতের সভ্যতা আজও লোপ পায়নি। পরবর্তী অধ্যায়ে এ বই হতে উদ্ধৃতি থাকবে।

তাঁর 'সভ্য সমাজের ক্রমবিকাশ' হল তাঁর যশোহর সাহিত্য সম্মিলনের বিজ্ঞানশাখার সভাপতির অভিভাষণ। জীতেন্দ্রনাথ বসু কর্তৃক Epochs of Civilizationএর তর্জমার কিয়দংশ হতে এইটি গ্রথিত হয়েছিল।

তাঁর লেখা প্রায় সবই ইংরাজী ভাষায়। (তাঁর বাঙ্গালা প্রবন্ধাবলী হতে

আগেই কিছু কিছু উদ্ধার করা হয়েছে) তা হতে কিছু কিছু তর্জমা করে দিলে প্রমথনাথকে জানবার সুবিধা হবে বিবেচনায় নিম্নে তা দেওয়া হল।

প্রথম মহাযুদ্ধের (একদিকে জার্মানী, অন্যদিকে ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশ) কারণ কী সম্বন্ধে তিনি একখানি পুস্তিকা—The Root Cause of the Great War) লিখেছিলেন (১৯১৫)। প্রাচীন সভ্যতার রীতি পদ্ধতি ধর্ম বর্জন করে ক্রমশ বিজ্ঞানাশ্রিত ধনগর্বী সভ্যতার এই ক্রমপরিণতি তিনি নানা তথ্য দ্বারা দেখিয়েছেন। যাতে দেশে দেশে যুদ্ধ না হয় তার জন্য অনুষ্ঠিত 'হেগ সভা' যে ফলপ্রসূ হয়নি ও হবার কথা নয় সে বিবরণ দিয়ে তিনি পরিশেষে বলেছেন।

যে পদ্ধতি পুরাতন সভ্যতার মাপকাঠিতে সত্যধর্মের অনুবর্তী হবে না তার কখনও সফলতা সম্ভব নয়। বৈজ্ঞানিক ও রাজনৈতিকদের দ্বারা ইউরোপের পরিত্রাণ আসবে না। তা হবে ঋষি ও মহাপুরুষের দ্বারা। সত্যধর্ম ও দর্শনের তুলনায় শিল্পসমৃদ্ধি ও রাজনীতি অলীক বস্তু। শান্তির জন্য যদি কোন আন্দোলন উপস্থিত করতে হয় তবে আধুনিক সভ্যতার স্বাভাবিক কুফলগুলির প্রতিরোধার্থ পুরাতন সভ্যতার প্রভাব ছড়াতে হবে এবং তার জন্যই আন্দোলন আরম্ভ করা দরকার।

…দয়া ও আত্মত্যাগ হল খৃষ্টধর্মের উচ্চ আদর্শ। উগ্র বস্তুতান্ত্রিক সভ্যতার যে বাতাস এখন পশ্চিমে বইছে তার সঙ্গে এই আদর্শের বিরোধ।…পশ্চিমের সমাজে ভালমানুষ ও দার্শনিকের কোন স্থান নেই। স্থান আছে ধনীর। ইউরোপেও যুক্তি ধর্মের স্থান ছিল। সপ্তদশ শতাব্দীতে যে আন্দোলন আরম্ভ হয়েছিল—Descartes, Pascal, Spinoza, Leibnitz-এর মত মহামতি মানুষের নেতৃত্বে—তা তৎকালীন ইউরোপের অঙ্গে একটা নৈতিক প্রলেপ বুলিয়েছিল। আধুনিক সভ্যতার দ্বারা যদি সে আন্দোনলের ফল মুছে না যেত তবে আজ আমরা ইউরোপের সত্যধর্মকে উন্নততর অবস্থায় পেতাম, এত যুদ্ধ ও লুটের আসক্তি দেখতাম না…কিন্তু পশ্চিমের সভ্যতা সত্যধর্মের পথে এখন যাবে না। তার দেরি আছে। যুদ্ধের যে আসক্তি আমরা দেখি তা ইউরোপীয় সভ্যতার বস্তুতান্ত্রিকতার একটি সুস্পষ্ট প্রকাশ। এই অবস্থা যদি বেশী দিন থাকে তবে অন্যান্য বস্তুতান্ত্রিক সভ্যতা যেন ধ্বংস হয়েছে এও তেমনি নষ্ট পাবে।"

ভারতবর্ষকে স্বায়ত্বশাসন দেওয়া যায় কিনা এবং কি ভাবে দেওয়া যায়

রামমোহনের সমাজ ও ধর্ম সংস্কার, বিবিধ উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানের কার্য বল্লভভাই প্যাটেলের রায়ত ও কৃষির উন্নতির চেষ্টা, গান্ধীজীর স্বাবলম্বিতা, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের শিল্পোন্নয়ন চেষ্টা, চরকা ও তাঁতিদের অগ্রগতি, মাদক নিবারণ চেষ্টা, রামকৃষ্ণ মিশনের বিবিধ কর্ম, রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতী, লাহোরের দয়ানন্দের সাধনা, সারা ভারতের আরও বহু নবতর বিশ্ববিদ্যালয়, ভারতীয় চিকিৎসার প্রসার, বিদেশে ভারতীয় বেদান্তের প্রচার ও সমাদর, আর্য সমাজের কাজ, বারাণসী ভারতধর্মমহামণ্ডলের প্রচেষ্টা, পণ্ডিচেরীতে শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমের প্রভাব, ভারত মহিলাদের অগ্রগতি—সবই তিনি পরম তৃপ্তির সঙ্গে আলোচনা করেছেন—ভারতের আধ্যাত্মিক মুক্তির আশা পোষণ করেছেন। তখন তাঁর বয়স হয়েছিল প্রায় ৭৪। তাঁর সারাজীবনের ভারতের মঙ্গল চিন্তা কিছু তৃপ্তি পেয়েছিল।

কিন্তু এইসব শক্তি—যার অতি সংক্ষিপ্ত উল্লেখ উপরে করা হয়েছে—পাশ্চাত্য সভ্যতার শক্তির প্রতিরোধ করার পক্ষে যথেষ্ট নয়।.. যে শক্তি কিছু দিন হতে সঞ্চিত হচ্ছে তা যদি এইভাবে ক্রমশ সঞ্চিত বর্ধিত হয় তবেই একটা ভবিষ্যৎ আছে। পৃথিবীর প্রাচীনকালের সভ্যতা, যা এখন ভারতের সভ্যতার মধ্যে মূর্ত হয়ে আছে—তারই প্রচার প্রভাব দ্বারাই মানুষের মুক্তি হতে পারে—সেই মানুষ দ্বারা যুদ্ধস্পৃহা, ঘৃণা, লোভ, স্বার্থপরতা, রিক্ততা, রোগ ও পাপের গভীর পঙ্কে দিন দিন তলিয়ে যাচ্ছে। এই সভ্যতার ভিত্তি হচ্ছে ত্যাগ ও ক্ষমা। ভারত ও চীনে এই সত্য উদ্‌ঘাটিত ও প্রচারিত হয়েছিল ৩।৪ হাজার বছর আগে—আজও সে সত্য অম্লান। ..”

আচার্য প্রমথনাথ

প্রমথনাথের A History of Hindu Civilization under British Rule বিখ্যাত পুস্তক। (ঘ) পরিশিষ্টে এই পুস্তকের আলোচ্য বিষয়ের বিস্তৃত বিবরণ আছে। তাঁর আরো নানা পুস্তকের বিবরণ সন অনুযায়ী পর্যায়ক্রমে পরিশিষ্টে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু রাঁচীর দীর্ঘ অবসর যাপনের কালে দেশের মঙ্গলের জন্য ধ্যানপরায়ণ আচার্য যে সব লেখা রেখে গেছেন তা আজো এই স্বাধীন ভারতের জনসমাজ ও রাষ্ট্রপরিচালকদের পক্ষে প্রয়োজনীয় বলে মনে হয়।

এখানে আমরা তাঁর চিন্তার নিদর্শন স্বরূপ দুইটি লেখা হতে উদ্ধৃতি ও তার তরজমা দিচ্ছি—

"Indian rural economy is marked by two broad features which it is desireable at the outset to place clearly before our readers. First, it is no exaggeration to say that nearly the whole of the rural population lives by the cultivation of the soil, a statement which can hardly be made of any other country in the world.

Famine Commissioners' estimate is that ninety percent of the rural population live more or less by agriculture. Secondly, Indian agriculture is preeminently a 'petite culture' and froms back-bone of the Indian village community of which the cultivator or ryot is the unit.

The village contains no doubt the blacksmith, the carpenter, the weaver, the potter and other handicrafts men besides the ryot, but all live for his benefit and are supported by the produce of his land. Take away the unit—the ryot—the whole village organisation breaks down. Various causes are now at work tending to draw the ryot from his land, to increase in fact the non-agricultural or landless class; but the love of the ryot for his small plot of land and homestead is so great that generations must yet be elapsed before this tendency will have any appreciable effect in disturbing the ancient rural organisation of India.

The ryot clings to his district with a tenacity which it is extremely difficult for an outsider to realise. Hence it is that the system of emigration devised by the Gorvernment with the best intentions to draw half-staved peasants from congested areas to sparcely populated ones, is not met with that amount of success which the system deserves."

"ভারতের গ্রামগুলির আর্থিক সংস্থার দুইটি বৈশিষ্ট্য। তা পাঠকদের কাছে আগেই উপস্থিত করা সংগত। প্রথমত একথা বললে কিছু বেশী বলা হবে না যে, গ্রামের লোকের একমাত্র কৃষিই জীবিকা। পৃথিবীর অন্য কোন দেশের পক্ষেই একথা খাটে না।

দুর্ভিক্ষ কমিশন ঠিক করেছেন যে, গ্রামের অন্তত শতকরা নব্বই জন লোক কৃষিকার্য দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে। দ্বিতীয়ত এই কৃষিকার্যের সঙ্গে যে 'স্নিগ্ধ কৃষ্টি' জড়িয়ে আছে তা হল, ভারতীয় গ্রাম্য সভ্যতার মেরুদণ্ড এবং প্রতি কৃষক বা রায়ত হল তার অংশ।

অবশ্য কৃষক ছাড়াও গ্রামে লোহার কামার, ছুতার, তাঁতি, কুম্ভকার ও অন্যান্য কারিগর থাকবে। কিন্তু এরা এই কৃষকদের প্রয়োজন মেটাতেই নিযুক্ত এবং তাদের অর্জিত ভূমি-শস্যই এদের পোষণ করে। যদি এই কৃষকদের গ্রাম হতে তুলে নেওয়া হয় তবে গ্রামের আর্থিকসংস্থা তৎক্ষণাৎ নষ্ট হবে। বর্তমানে বহু কারণ পরম্পরায় ভূমি হতে এই কৃষকরা সরে যাচ্ছে, তাতে অকৃষক ও ভূমিহীন মানুষের সংখ্যা বাড়ছে। কিন্তু তার ঐ ছোট জমি ও বাড়ীর উপরও কৃষকের এত মমতা যে আরও কয়েক পুরুষ পর্যন্ত এই ভাবেই চলবে। তারপর হয়তো ভূমি ছেড়ে যাবার প্রবৃত্তি এতখানি প্রকাশিত হবে যে, ভারতের গ্রামের প্রাচীন অর্থ নৈতিক সংস্থায় বিপর্যয় আসবে।

কৃষকরা তার নিজ নিজ জেলা ছেড়ে যেতে চায় না। কেন যে যেতে চায় না বাইরের মানুষ তা উপলব্ধি করবে না। এজন্যই যেসব স্থানে বসতি খুব ঘন, সেখান হতে অপেক্ষাকৃত কম বসতির স্থানে লোক সরিয়ে নেবার গভর্নমেণ্টের চেষ্টা ততখানি সফল হয়নি যতখানি সফল হওয়া উচিত ছিল।"

"Excessive material development inevitably leads to highly unequal distribution of wealth. As a consequence of disparity, society is divided into two classes—one the smaller rolling in wealth and luxury, and the other, much larger of the two grovelling in poverty and misery. Both of these classes being governed by no higher ideal than that of material development, no higher aspiration than the attainment of physical benefits, there is ceaseless jealousy and strife between them.

Greece attained to the third stage, but did not make

progress in it. The extinction of her Civilization is mainly attributed to this incomplete development of ethical and spiritual culture. The moral conciousness of Greece as exhibited by Plato, probably the best exponent of her higher culture, recognised four cardinal virtues—wisdom, courage, temperence and justice. Aristotle's test of the principal virtues is based upon that of Plato.

Neither altruism, nor even such restricted benevolence as would embrace the whole nation has a place in either. The material element of the Greek Civilization was never well balanced by the spiritual. Wealth had been made the criterion of social rank by Solon during the second stage of her civilization and that standard continued in the third.

For several centuries there was constant struggle between the rich and the poor, the Oligarchy and Democracy. If Greece would have succeeded in building up a hormonious system of civilization, if material and spiritual element have been sufficiently well balanced, it would have survived the loss of her independence."

ভাবার্থ—"কোন দেশে অতিরিক্ত ধনসম্পদ বৃদ্ধি হলে তা সমাজে বড় অসমভাবে ভাগ হয়ে যায়। এইরূপ অসমান ভাগের ফলে সমাজ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে পড়ে। একটি ছোট দল, সম্পদ ও বিলাসে গড়াগড়ি যায়; অন্যটি অনেক বড় দল, দারিদ্র্য ও দুঃখে চতুর্দিক অন্ধকার দেখে। এই দুই দলেরই আদর্শ হল সংসারের সম্পদ, তার চাইতে বড় কিছু নেই। কি করে এই দেহের সুখকর ঐশ্বর্য আয়ত্ব হয়—তাই-ই একমাত্র কাম্য। তারই ফলে চলে দুই দলের মধ্যে একটা অশান্ত ঈর্ষা ও দ্বন্দ্ব।

গ্রীসের এই অবস্থা হয়েছিল, কিন্তু এই দ্বন্দ্ব হতে মুক্ত হতে পারেনি বলেই গ্রীসের সভ্যতা নষ্ট হয়েছে। বিশেষ করে মানবতা ও ধর্মের দিকে তাদের সভ্যতার পুষ্টি অপূর্ণ ছিল বলেই এরূপ ঘটেছে, বলা হয়। গ্রীসের নীতির প্রকাশ হয়েছে প্লেটোয়—যিনি গ্রীসের উচ্চাঙ্গের কৃষ্টির লক্ষণ নির্দেশ করেছেন

চারিটি গুণপনায়—জ্ঞান, সাহস, সংযম ও সুবিচার। এরিষ্টটল এই গুণগুলির সংজ্ঞা নির্ণয়ের যে পদ্ধতি দিয়েছেন তা প্লেটোর সঙ্গে মিলে যায়।

তাঁদের কারো হিসাবেই ছিল না পরের সেবার কোন কল্পনা। কেবল নিজের জাতির সীমানার মধ্যেই মানুষের মঙ্গল হবে, এমন দয়া দাক্ষিণ্যেরও স্থান ছিল না। গ্রীসের এই সম্পদ-আশ্রয়ী সভ্যতা একেবারে একমুখী ছিল, কোন আধ্যাত্মিক চিন্তা তার গতিকে সুসঙ্গত করেনি। গ্রীসের সভ্যতার দ্বিতীয় স্তরে সোলান (Solon) ব্যবস্থা করেছিলেন যে, যাঁর যত ধন তাঁর তত সম্মান। এই অবস্থা তৃতীয় স্তর পর্যন্ত চলেছিল।

বহু শতাব্দী ধরে ধনী ও দরিদ্রের সংঘর্ষ চলেছিল। অল্প সংখ্যক স্বেচ্ছাচারী লোকের শাসনের বিরুদ্ধে সাধারণতন্ত্রের ছিল চিরবিরোধ। গ্রীস যদি সুসামঞ্জস্যপূর্ণ সভ্যতার রীতি নীতি সৃষ্টি করতে পারত, যদি তার ধনসম্পদ ও আধ্যাত্মজ্ঞানের একটা সমন্বয় বিধান হত তবে সে স্বাধীনতা হারাত না—গ্রীস আজও স্বাধীন থাকত।"

আচার্যের বহু জ্ঞানলব্ধ এই ইঙ্গিত আমাদের জাতীয় জীবনের পথ নির্দেশ করুক।

তিরোধান

নানা দিক হতে প্রমথনাথকে জানবার আমরা চেষ্টা করেছি। যতটুকু জেনেছি তাতেই আমাদের চিত্তের আসনে তিনি বসেছেন। তাই তাঁর মৃত্যু আমাদের কাছে একটা অধ্যায়ের শেষ মাত্র—চিরবিরাম নয়।

ভূগর্ভে থাকে নানা খনিজের আকর। তার অনেক খনিজের উৎপত্তি হয় উদ্ভিদ ও জীবদেহ হতে। দেহের রূপান্তর দেখে জ্ঞানবানের চিত্তে প্রশ্ন জাগে, তবে কি এক প্রাণশক্তি হতেই জগতের এই বিচিত্র সজীব ও অজীবের সৃষ্টি?

সম্ভবত ভারতীয় ধর্ম সভ্যতার উপাসক ভূতত্ত্ববিদ প্রমমনাথ এই প্রশ্নের উত্তর পেয়েছিলেন বলেই ভবনদী উত্তীর্ণ হবার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করে রেখেছিলেন, তাঁকে দীর্ঘকাল রোগ ভোগ করতে হয়নি।

পরিশিষ্ট

(ক) বিলাতে থাকার সময় প্রমথনাথের প্রবন্ধ

1. Undescribed Fossil Carnivora from Sivallic Hills in the Collection of the British Museum.

The Quarterly Journal of the Geolog. Soc. of London, Feb., 1880

2. Notes on the History and Comparative Anatomy of the Extinct Carnivora—Geological Magazine, Vol., VII, 1880

(খ) প্রমথনাথ বসুর রচিত বাংলা পুস্তকের তালিকা

১। অবকাশ কুসুম—বাংলা কবিতা পুস্তক, ষোল বৎসর বয়সে রচিত। ১৮৭১ সনে প্রকাশিত।

২। প্রাকৃতিক ইতিহাস ১৮৮৪ (দুষ্প্রাপ্য)—মূল্য ৫০ পঃ, ৯৪ পৃঃ। (Rudiments of Geology and Physical Geography)

৩। বিবিধ প্রবন্ধ, ১৮৯২ (বাংলা ১২৯৯ সাল)—'নবজীবন' ও 'ভারতী' হতে পুনর্মুদ্রিত। ইহাতে আছে, হিন্দুধর্মের নবজীবন; উপায় কী? ভারতে বিলাতী সভ্যতা; বাঙ্গলা ভাষায় বিজ্ঞান শিক্ষা; কেঁচো; গৌড়গীত; ফুলের প্রতি; হিমালয়ে নীহার বাহুর পাশে।

৪। শিশুপাঠ—১৮৯২।

৫। সভ্যসমাজের ক্রমবিকাশ—১৯১৬।

(গ) ভারতের খনিজ বিষয়ে প্রমথনাথের আবিষ্কার-প্রবন্ধের তালিকা ১৮৮৪ হতে ১৮৯৩ সন

১৮৮৪ Geology of the Lower Narbada Valley between Nimawar and Kawat, Mem. G. S. I., XXI, 1—72

Notes on Lignite near Raipur, Central Provinces, Record, G. S. I., XVII, 130—31

১৮৮৭ The Iron Industry in the Western Portion of the District of Raipur. Record, G. S. I., XX, 167—170

১৮৮৮ Notes on the Igneons Rocks of the Districts of Raipur and Balaghat, Central Provinces, Record, G. S. I., XXI, 56—61

The Manganese—Iron and Manganese ores of Jabalpur, Record, G. S. I., XXI, 71—89

Notes on some Mica-Traps from Barakar and Raniganj. Record, G. S. I., XXI, 163—165

১৮৮৯ The manganfeous Iron and Manganese ores of Jabbalpur. Records, G. S. I., XXII, 216—226

১৮৯০ The Darjeeling Coal between the Lisu and the Ramthi Rivers, explored during season 1889—90 Record., G. S. I., XXIII, 237—258

১৮৯১ Extracts from the Journal of a trip to the Glaciers of the Kabru, Pandim etc., Records, G. S. I., XXIV, 46—48

Further note on the Darjeeling Coal exploration. Records, G. S. I., XXIV, 212—21

Notes on the Geology and Mineral Resources of Sikkim, Records, G. S. I., XXVI, 217—230

১৮৯৩ Notes on Granite in the District of Tavoy and Megui, Records, G. S. I., XXVI, 102—103

Notes on the Geology of a part of Tennasserim Valley with special reference to Tendau and Kamapying Coal-field. Records, G. S. I., XXVI, 148—168

এই শেষোক্ত দু'টি ব্রহ্মদেশ সম্বন্ধে,

চাকরীতে থাকাকালে প্রমথনাথ আসামের উমরিলেঙের কয়লার স্তর সম্বন্ধে যে রিপোর্ট লিখেছিলেন তা [১৯০২-৩] গভর্নমেণ্টর XXXI সংখ্যা রেকর্ডে আছে।

(ঘ) ইংরাজী পুস্তক ও পুস্তিকার তালিকা

১৮৭৭ Indo-Aryan Civilisation (দুষ্প্রাপ্য), লণ্ডনে মুদ্রিত

১৮৮৪ The Centenary Review of the Researches of the Asiatic Society of Bengal, 1784—1883.

১০৬ পৃষ্ঠার বই ; সঙ্গে শ্রেণীবিভাগ করা বিবিধ বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের তালিকা ; তাও ১০০ পৃষ্ঠার উপর।

১৮৮৬ Technical and Scientific Education in Bengal (পুস্তিকা)

১৮৮০ হতে আরম্ভ করে প্রমথনাথের বক্তৃতা, প্রবন্ধ ও পুস্তিকা— কতকগুলি একত্র করে Essays and Lectures নামে ১৯০৬ সনে ছাপা হয়।

তার পরিচয় এখানে দিলে ভাল হয় ;—তাতে ছিল—

১। A plea for Patriotic Movement (National Magazine, May, 1903).

২। The Possiblities of Handloom Weaving in India (Hindusthan Review, Feb., 1906).

৩। Technical and Scientific Education in Bengal (পুস্তিকা, ১৯০৬).

৪। Scientific and Technical Education in Bengal (Statesman, July 1906).

৫। Industrial Development of India—(বেঙ্গল ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল কনফারেন্সে প্রদত্ত সভাপতির অভিভাষণ, ১৮৯১)।

৬। Industrial Development by Indian Enterprise (কলকাতায় প্রদত্ত বক্তৃতা, ১৯০৬)।

৭। Caste System in India, its Origin and History (ব্রিষ্টলের যাদুঘর ও গ্রন্থাগারে প্রদত্ত বক্তৃতা, মার্চ, ১৮৮০)।

৮। Hindu Civilization during Moslem rule (The Calcutta Review, Jan. and July, 1893).

৯। The Industrial Conference (The Statesman, Sept., 1906).

১০। Lessons in a street (কলকাতায় প্রদত্ত বক্তৃতা, আগষ্ট, ১৮৮৪)।

১১। Notes on some Earthen pots found in the Alluvium at Mahesvara (J. A. S. B., Vol., Part I., 1882).

১২। Notes on Mahishmati or Mahesvara (Mahesar) on the Narmada and the identification of Hiouen Thsang's Mahesuarapura (Proc. A. S. B., July and Aug., 1893).

১৩। An Eastern View of Western progress (West Minister Review. 1901 and East and West, 1903); Chhattisgar, notes on its tribes, sects and caste (J. A. S. B., Vol., LIX., Pt. I, 1890)

১৯১৭ সনে এই পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

১৮৯০ Rudiments of Geology and Physical Geography.

১৮৯৪-৬ A History of Hindu civilisation during British rule, 3 Vols. এই বিরাট গ্রন্থ তাঁর অসাধারণ জ্ঞান ও চিন্তাশক্তির পরিচয় দেয়। কি ভাবে তিনি এই বিপুল বিষয়টির আলোচনা করেছেন উপক্রমণিকায় তার পরিচয় দিয়েছেন। তা হতে তর্জমা করে কেবল বক্তব্যের আভাস দিচ্ছি—এতে প্রমথনাথের নিজের জীবন ও তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গেও পাঠকের সংযোগ স্থাপিত হবে।

ধর্ম সভ্যতার নিশ্চিত নিদর্শন নয়; ধর্ম হতে কৃষ্টির উন্নতি ও কৃষ্টি হতে ধর্মের ক্রমোন্নতি; যে সব কারণে ধর্মের উপর কৃষ্টির প্রভাব সংযত হয়।

হিন্দু সভ্যতার উপর ধর্মের প্রভাব; হিন্দুচিত্তের উপর ধর্মের প্রভাবের উদাহরণ—যোগীগণ; ধর্মানুষ্ঠানে ধনের ব্যবহার; সাম্প্রতিক ধর্মান্দোলন; হিন্দুরা সাধুতাকেই সম্মান করেছেন, ধনসম্পত্তিকে নয়; হিন্দুর ধর্মজীবন একেবারে নিষ্ক্রিয় নয়; ধর্মের শাসনে অবিমিশ্র শুভ হয় না; দেশপ্রেমের অভাবের অন্যতম কারণ হল জাতি বিচার; ধর্মে হস্তক্ষেপ করলে তা সংগ্রামের যথেষ্ট কারণ বলে হিন্দুরা মনে করেন; এতকাল ধর্মই হিন্দুদের একমাত্র গ্রন্থনসূত্র, ধর্মের রক্ষণশীলতা জাতির অগ্রগতির অন্তরায়।

খৃষ্টধর্ম হতে উদাহরণ, অবিশ্বাসীদের দণ্ডবিধান; গ্যালিলিও

ও ব্রুনোর উপর অত্যাচার ; খৃষ্টধর্মের রক্ষণশীলতার সংস্কার দ্বারা অগ্রগতির সহায়তা ; ধর্মের ভিত্তিতেই হিন্দুত্বের সার্বভৌমিকতা এবং কৃষ্টিও তার অগ্রগতির সহায়ক।

সামাজিক ব্যাপারে হিন্দুত্বের প্রতিবাদকতা অগ্রগতির অন্তরায় : ঐরূপ প্রতিবন্ধকতার ফল হল গতিহীনতা ; জাতিবিচার, তার কুফল ও সুফল ; মুসলমান আমলের আগে হিন্দু-সামাজিক উন্নতি ; সে উন্নতি ও পাশ্চাত্য দেশের সমাজের উন্নতি একরকম নয় ; বৈদিক যুগের প্রথম দিকের স্বাধীনতা ; তার সঙ্গে নীতিহীনতা ; পরবর্তী বৈদিক যুগে নৈতিক আন্দোলন ও তার রূপ ; বাল্যবিবাহের সূত্রপাত ; খাদ্য ও পানীয়ের বিধিনিষেধের কারণ ; পুরাণের যুগে হিন্দুসভ্যতার অবনতি—তজ্জন্য ধর্ম ও সমাজ ব্যবস্থার কড়াকড়ি।

সভ্যতার উপর প্রকৃতির প্রভাব ; ধর্ম ও কৃষ্টির অগ্রগতির উপর প্রকৃতির প্রভাব ; হিন্দুসভ্যতার উপর প্রকৃতির প্রভাব ; 'কর্মফল' ও নীতির প্রভাব।

হিন্দুদের স্বভাবে যুদ্ধপ্রীতি নাই ; ব্রিটিশের শাসনে হিন্দুসভ্যতাই বেশী প্রভাবিত হয়েছে ; হিন্দুসমাজ ব্যবস্থা তাকে তুলনায় অপেক্ষাকৃত স্বার্থত্যাগী করেছে ; কিন্তু পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার সংস্পর্শে ক্রমশ ব্যক্তিগত স্বার্থস্পৃহা বৃদ্ধি পাচ্ছে ; পাশ্চাত্যের প্রভাবে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যও বৃদ্ধি পেয়েছে। বৈদিক যুগে চারুশিল্প ও প্রস্তুতিশিল্প এবং বৌদ্ধ-হিন্দুকালে তাদের অবস্থা ; মোগল রাজত্বের আমলে প্রজাদের আর্থিক অবস্থা—মজুরদের অবস্থা—কারিগরদের অবস্থা ; এক শতাব্দী আগে ভারতের শিল্পগুলির অবস্থা ; মুসলমান আমলে আগত ইউরোপীয় পর্যটকদের প্রদত্ত বিবরণ হতে ভারতীয়দের অবস্থা ; মনরিক, মণ্ডেসলো, বার্নিয়ার ; দেশীয় শিল্পের বিনষ্টের হেতু ; এই বিনষ্টের ফল ; ভূমির উপর চাপের বৃদ্ধি ; চাষীদের অবস্থা ; দিনমজুরদের অবস্থা, মধ্যবিত্তদের অবস্থা ; এই ক্রমবর্ধমান দুঃখের নিষ্কৃতি হবে কেবল শিল্পের বিস্তৃতির দ্বারা ; জাতীয় কারুশিল্প।

১৯১৩ Epochs of Civilisation (1913)

এই পুস্তকের কিয়দংশের তর্জমা করে 'সভ্যসমাজের ক্রমবিকাশ'

পুস্তিকা রচিত হয়। ইহাই যশোহরের বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের অধিবেশনে বিজ্ঞান শাখার সভাপতির অভিভাষণরূপে পঠিত হয় (১৯১৬)।

১৯১৫ The root cause of great war
১৯১৬ The illusions of New India
১৯১৭ Give the people back their own
১৯১৮ The Montague-Chemsford Reform scheme and Indian Nationhood
১৯২১ Survival of Hindu Civilization
১৯২১ National Education and Modern Progress
১৯২৪ Degeneration—a world problem
১৯২৭ Some present-day superstition
১৯২৯ Swaraj—Cultural and Political
.... Hindu Moslem Amity

(ঙ) প্রমথনাথের কতকগুলি প্রবন্ধের তালিকা— যা পুস্তকাকারে দেখা যায়নি

১৮৮৪ Educational Reforms in Bengal (The Calcutta Review, Jan., 1884)
১৯১৪ The greatest illusion of the present age (Modern Review, Oct., 1914)
১৯৩২-৩৪ Reminiscences and Reflections of a Septuagenarian (Amrita Bazar Patrika)—এইটি ক্রমশ প্রকাশিত দীর্ঘ আত্মজীবনী।

১৯৩৪ সনের ২৭শে এপ্রিল প্রমথনাথের মৃত্যু হয়; সুতরাং আজীবন তাঁর লেখনী পরিচালিত হয়েছিল।

শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত লিখিত
বিজ্ঞান-সাধকদের চরিতমালা
পণ্ডিতমণ্ডলী ও পত্র-পত্রিকা দ্বারা উচ্চপ্রশংসিত নির্ভরযোগ্য
চিত্রশোভিত সুমুদ্রিত

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ঃ রঞ্জন পাবলিশিং হাউস প্রকাশিত,
নূতন সংস্করণ

আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুঃ (ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানী প্রকাশিত)

ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারঃ (ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানী প্রকাশিত)

অভিমত

রাজশেখর বসুঃ চমৎকার হয়েছে।…স্কুলের পাঠ্য অথবা পারিতোষিক গ্রন্থ হবার যোগ্য।

ডাঃ সুশীলকুমার দেঃ সুলিখিত, তথ্যপূর্ণ।…শিক্ষিত বাঙ্গালী মাত্রেরই পঠণীয়।

Hindusthan Standard: Lucid and highly interesting.... pleasing pen picture.

The Indian PEN: Precise, matter of fact, skillfully collected and sifted information with the sole object of rendering the subject easy to understand—elaborately dealth —authentically placed.

অধ্যাপক শ্রীপ্রমোদনাথ দাসঃ শুধু তরুণেরা নয়, প্রবীণেরাও উপকৃত হবেন। রবীন্দ্র ও জগদীশচন্দ্রের সৌহার্দ্র-চিত্র সুন্দর ফুটিয়াছে…।

ডাঃ শ্রীহরগোপাল বিশ্বাসঃ এরূপ মনোলোভা ভাষায় লিখিত সম্পূর্ণ জীবনী অন্যত্র দেখা যায়নি।

আনন্দবাজার পত্রিকাঃ ভাষা প্রাঞ্জল, সরল ও সুপাঠ্য।

Amrita Bazar Patrika: Shri Gupta has rendered a service to the Nation; attractive style.

জ্ঞান ও বিজ্ঞানঃ যে প্রয়োজনীয়তা বহুদিন ধরেই অনুভূত হচ্ছিল শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত সেই প্রয়োজন মিটিয়েছেন।

কবি শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক : চমৎকার হয়েছে।

অধ্যাপক শ্রীপ্রিয়দারঞ্জন রায় : হৃদয় দিয়ে অনুভব করে হৃদয় দিয়েই তা কথায় রূপায়িত করেছেন। লেখা সহজ, সরল ও সুখপাঠ্য হয়েছে।

যুগান্তর : লেখক অতি নিষ্ঠার সঙ্গে পরিবেশন করিয়াছেন

শিশুসাথী : কীর্তি চমৎকার ভাবে বিবৃত করেছেন···বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়।

স্বাধীনতা : হৃদয়গ্রাহী এবং সুলিখিত···সহজ সরল ভাষা···বিজ্ঞানের প্রতি গভীর আগ্রহ সঞ্চারিত করিবে।

বহু সংখ্যক পত্র-পত্রিকা দ্বারা উচ্চ প্রশংসিত।

শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত রচিত ইংরাজী পুস্তক

Two New Pala Records : (First published in Journal of Asiatic Society)

Sir Jadunath Sarkar, Prof. Dineshchandra Bhattacharjee, Prabodhchandra Sen, Chintaharan Chakravorty, Doctors D. C. Sircar, J. N. Banerjee, Niharranjan Ray, U. N. Ghosal, Shri Jogendranath Gupta, Doctors L. Renoe (Paris), L. D. Barnett (London), Mr. J. Allen (Edinburgh) প্রভৃতি উচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন।

Historical Relics etc. in the Bangiya Sahitya Parisad Museum : (Published by Bangiya Sahitya Parisad)

Modern Review, Amrita Bazar Patrika, দেশ, Hindusthan Standard প্রভৃতি কর্তৃক প্রশংসিত।

———

লোকবিজ্ঞান গ্রন্থমালা (৩)

আচার্য প্রমথনাথ / মনোরঞ্জন গুপ্ত

দাম : দুই টাকা চল্লিশ পয়সা।